মানব মন

বিশেষ পাভলভ সংখ্যা
অক্টোবর ১৯৬১

◆

এ সংখ্যার লেখক

আই. পি. পাভলভ
ডাঃ রুদ্রেন্দ্র কুমার পাল
ডক্টর জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
মোহম্মদ আব্দুল করিম
তরুণ চট্টোপাধ্যায়
ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
প্রমুখ

◆

অল্প পরিশ্রমেই
আপনি যদি
অবসন্ন হয়ে পড়েন
তখন নিয়মিত ব্যবহারে

ভাইনো-মল্ট
প্রাণোচ্ছল টনিক

আপনাকে
উদ্দীপনা দেবে

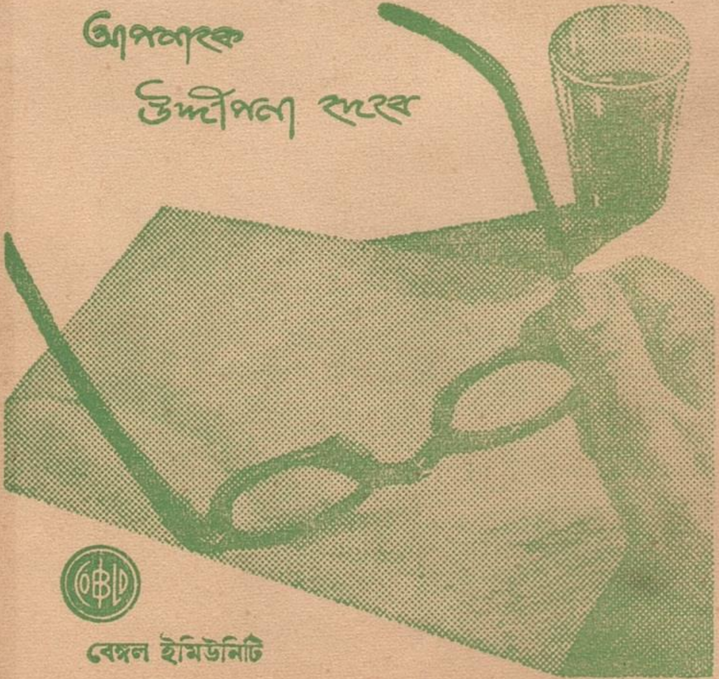

বেঙ্গল ইমিউনিটি

/BI/VM/1-59

মানবমন : সংকলন : ২
বিশেষ পাভলভ সংখ্যা
অক্টোবর ১৯৬১

সূচীপত্র

পাভলভ স্মরণে — ৫
মনের কথা : ১॥ — ৭ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
বেদনারহিত সন্তান প্রসব — ৯ ডা: রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ — ১৫ ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোঃ
প্রাচীন আর্য-সমাজ নারী ও পুরুষ — ২৫ ডক্টর জানকী বল্লভ ভট্টাচার্য
ঘুমের শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য — ৩০ আই. পি. পাভলভ
মানব-মস্তিষ্ক — ৩৫ সবিতা মুখোপাধ্যায়
পর্দার উপর মস্তিষ্কের জৈব বিদ্যুৎ প্রবাহের ছবি — ৪২ সমর গুপ্ত
মানুষ ও স্বয়ং চালিত যন্ত্র — ৪৫ তরুণ চট্টোপাধ্যায়
শিক্ষণে মনোবীক্ষণ — ৫০ মোহম্মদ আবদুল করিম
পাভলভ পরিচিতি (২) — ৫৬
মনরোগের কারণ নির্ণয়(১) — ৬০ মনোবিৎ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টামণ্ডলী

ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
শ্রীগোপাল হালদার
ডাঃ সুধীন বন্দ্যোপাধ্যায়
ডক্টর জানকী বল্লভ ভট্টাচার্য
শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
ডাঃ অজিত দেব
ডক্টর অরুণা হালদার
ডাঃ বিনয় ভট্টাচার্য
ডাঃ সন্তোষ দাস ●
ডাঃ সন্তোষ বোস ●
শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়

চতুষ্কোণ
প্রগতিশীল ত্রৈমাসিক পত্রিকা

পূজা সংখ্যায় আছে—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভবতোষ দত্ত, অশোক রুদ্র, বিনয় ঘোষ, রাম বসু, সুনীল সেন, শঙ্কর ঘোষ ইত্যাদির প্রবন্ধ ও মতি নন্দীর উপন্যাস 'ফেরারী' ; গগণেন্দ্রনাথের ছবি—
৩০০ পৃষ্ঠার অধিক—দাম দু' টাকা

ন্যাশনাল পাবলিশার্স
২০৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলি-৬

রুষ-ভারতী
ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার মুখপত্র
সম্পাদক—ডক্টর মহাদেব সাহা
দাম ৭৫ নয়া পয়সা

প্রাপ্তিস্থান :—
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী
কলিকাতা-১২

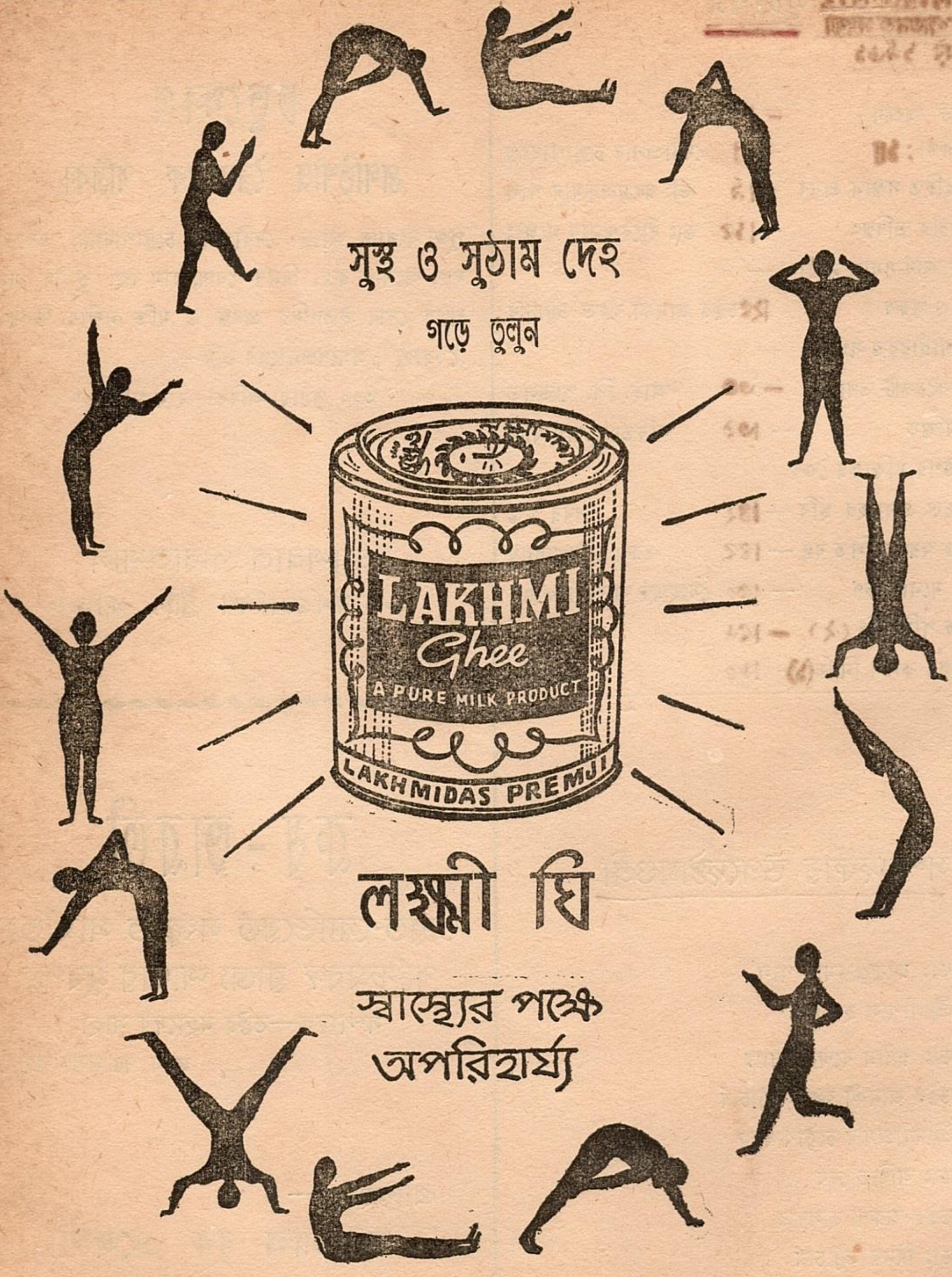
সুস্থ ও সুঠাম দেহ
গড়ে তুলুন
LAKHMI
Ghee
A PURE MILK PRODUCT
LAKHMIDAS PREMJI
লক্ষ্মী ঘি
স্বাস্থ্যের পক্ষে
অপরিহার্য্য

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী · কলিকাতা-১২

With best compliments from :

M/s. HIMALAYA DRUG CO.

BOMBAY-1

MAKERS OF WORLD FAMOUS
RAUWOLFIA SERPENTINA TOTAL ALKALOID

"SERPINA"

With best compliments from :—

United Service Station

CALTEX PETROLIUM DEALERS
1/C, ASHUTOSH MUKHERJEE ROAD,
CALCUTTA.

'সোভিয়েত দেশের গ্রাহক হোন'

১৯৬১ সনের ১লা নভেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও বাংলা, উড়িয়া, ইংরাজী, হিন্দী, নেপালী এবং আরও অন্যান্য আটটি ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সচিত্র পাক্ষিক **"সোভিয়েত দেশ** পত্রিকার" নববর্ষের গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান সুরু হইবে। বর্তমান বৎসরের নভেম্বর মাস হইতে **"সোভিয়েত দেশ"** পত্রিকা অসমীয়া ভাষায় প্রকাশিত হইতে চলিয়াছে। নূতন গ্রাহকগণ চাঁদার বিশেষ হ্রাস মূল্যের সুযোগ এবং বিচিত্র বর্ণ সুশোভিত নববর্ষের আকর্ষণীয় দেওয়াল-পঞ্জি পাইবেন। চারি টাকা দিয়া বাৎসরিক গ্রাহক হওয়া যাইবে। সাত টাকায় দুই বৎসরের এবং দশ টাকায় তিন বৎসরের গ্রাহক হওয়া যাইবে।

ব্যবসা সংক্রান্ত নিয়মাবলী জানিবার এবং চাঁদা পাঠাইবার ঠিকানা ঃ—

সোভিয়েত দেশ অফিস
১১ উড ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১৬

অত্যাশ্চর্য্য গুণাবলী

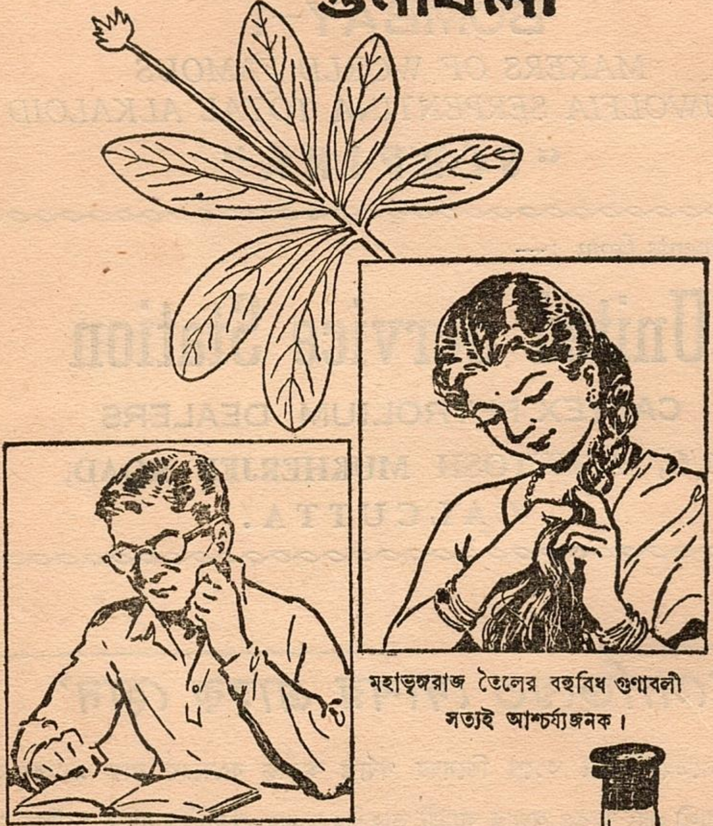

মহাভৃঙ্গরাজ তৈলের বহুবিধ গুণাবলী
সত্যই আশ্চর্য্যজনক।

ইহা যে শুধু কেশের পক্ষেই উপকারী
তাহা নহে, মস্তিস্কের পক্ষেও পরম হিতকর।

সাধনার
মহাভৃঙ্গরাজ
তৈল

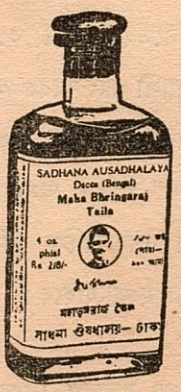
SADHANA AUSADHALAYA
Dacca (Bengal)
Maha Bhringaraj
Taila
4 oz.
phial
Rs. 2/8/-
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
সাধনা ঔষধালয়— ঢাকা

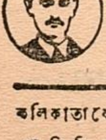

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা- ৪৮

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম, বি, বি, এস, (কলিঃ) আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.
আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস, (লণ্ডন) এম, সি, এস, (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

SA 5/60

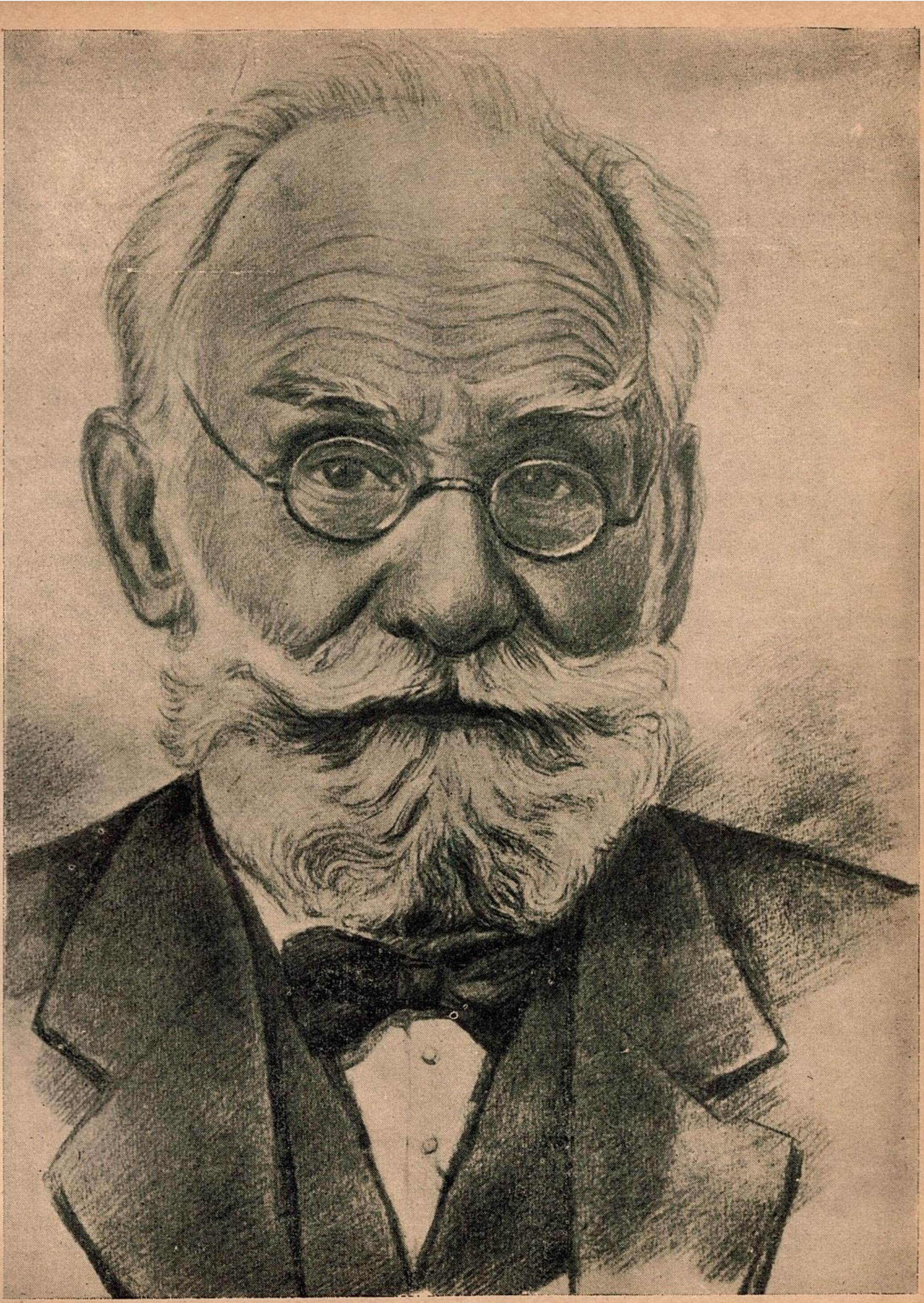

আইভান পেত্রোভিচ পাভলভ

(১৮৪৯—১৯৩৬)

পাভলভ-স্মরণে

“মানবমন প্রকৃতিকে বশীভূত করে নিত্যনতুন বিজয় পথে এগিয়ে চলেছে; শুধু ভূপৃষ্ঠই নয়, জীবনের প্রয়োজনে সমুদ্রের অতল গহ্বর থেকে বায়ুমণ্ডলের বহির্ভাগে অবস্থিত সব কিছুকেই জয় করতে সে সমর্থ; প্রয়োজনমত বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সঞ্চারিত করতে পারে স্বায়ত্ত অপার শক্তি; আত্মচিন্তা সংক্রমণের জন্য মহাকাশের দূরত্বের বিলোপ সাধনেও সে সক্ষম। কিন্তু এই মানব প্রকৃতিই আবার অন্ধশক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে যুদ্ধ করে, ধ্বংস করে, আতঙ্কের সৃষ্টি করে; ফলে ঘটে অপরিসীম ক্ষয়ক্ষতি; ফলে সে নিজেই যন্ত্রনা পায়, পশুপ্রকৃতিতে ফিরে যায়।

বিজ্ঞান, মানবচরিত্র সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান,—সর্বশক্তিশালী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই জ্ঞানলাভের আন্তরিক প্রচেষ্টাই পারে শুধু মানুষকে বর্তমান কালিমা থেকে মুক্ত করতে এবং আন্তর্মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার সাম্প্রতিক গ্লানি অপনোদন করতে।”

—আই. পি. পাভলভ

আজ আইভান পোত্রভিচ পাভলভের ১১২তম জন্মদিনে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে আমরা স্মরণ করছি। উপরের উদ্ধৃতি মানব-মন এর পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করছি এই মহান্ বৈজ্ঞানিকের মানবপ্রীতির নিদর্শন হিসাবে।

মানুষকে বিশেষ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে দেখে মানব-প্রকৃতি সম্পর্কে ক্ষতিকর ও ভ্রমাত্মক ধ্যানধারণা প্রচার করেছেন নীৎসে, হব্‌স্, শোপেনহাওয়ার, ফ্রয়েড ও তাঁদের অনুগামী দল। এঁরা কেউ দেখেছেন দারিদ্র্য-জর্জরিত, অশিক্ষিত, কুসংস্কারচ্ছন্ন মানবগোষ্ঠী, কেউ জেনেছেন শুধু ব্যাভোরিয়ান সামরিক অধিনায়কদের মতিগতি, কেউ বা শুধু কয়েকটি নিউরোটিক মানুষের ভ্রান্ত চিন্তাভাবনা। কাজেই তাঁদের কাছ থেকে যে-মনস্তত্ত্বের সূত্র আমরা পেয়েছি তাকে বলা চলে বনজঙ্গলের মনস্তত্ত্ব—বন্য-মানুষের অপরিণত মনের তত্ত্ব।

আজকের জীববিজ্ঞানীরা জানেন যে—পশুমাত্রেই হিংসা করে না; অনেক পশু দলবদ্ধ হয়ে থাকতে চায় ও গোষ্ঠীস্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে বড় করে দেখে। নেকড়েই একমাত্র প্রাণী নয় মেষও প্রাণী। শিম্পাঞ্জীরা শান্ত ও সহযোগিতায় অভ্যস্ত। হিংসার প্রকাশ অহেতুক নয়, স্বভাবগত নয়—পরিবেশগত।

নৃতত্ত্ববিদ্‌দের মতে—আদিম মানবগোষ্ঠীর মধ্যেও হিংসার ও লোভের প্রকাশ সার্বিক নয়, স্বভাবগত নয়। যেমন একদিকে দেখতে পাই—‘চুক্‌চি,’ ‘দোবু’ প্রভৃতি গোষ্ঠী—হিংস্র ও ভীষণ,—তেমনি আছে ‘আরাপেশ’ জাতীয় গোষ্ঠী—শান্ত-ঠাণ্ডা ও বন্ধুভাবাপন্ন। এখানেও দেখি খাদ্য প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা, স্বল্পতা অর্থাৎ অনিশ্চিত পরিবেশ চুক্‌চিদের হিংস্র করেছে—আর পরিবেশ নির্ভরযোগ্য হওয়ায় আরাপেশদের স্বভাব হয়েছে ভিন্ন।

শিশুরা নাকি স্বভাবত স্বার্থপর, হিংস্র ও ধ্বংসকামী। ফ্রয়েডপন্থীদের এই রকমই ধারণা। ম্যাসলো বলেছেন—The child, who is insecure, basically thwarted & threatened in his needs for safety, love-belongingness and self-esteem ; is the child who will show selfishness, hatred, aggression and destructiveness : Sheer curiosity is sometimes erroneously interpreted as destructiveness.

যে-অন্ধ শক্তির উল্লেখ পাভলভের উদ্ধৃতিতে রয়েছে—সে-শক্তি মানুষের অন্তর্নিহিত প্রকৃতিগত শক্তি নয়। এই অন্ধ শক্তি—এই শোষণধর্মী সমাজের শোষণনির্ভর একশ্রেণীর স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত, এই অন্ধশক্তি সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার পরিবেশ-সঞ্জাত। সামাজিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেলে, বণ্টন বৈষম্য দূরীভূত হলে, এ-অন্ধশক্তির মৃত্যু অবধারিত।

হব্‌স্‌, শোপেনহাওয়ার, ফ্রয়েডের প্রভাব আজও ব্যাপক নিঃসন্দেহ, তবুও মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ধারার সন্ধান পেয়েছি আজ। মননক্রিয়ার শারীরবৃত্তমূলক ক্রিয়াকলাপের সন্ধান পাওয়া গেছে পাভলভীয় মস্তিষ্কবিজ্ঞানের দৌলতে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে-মননক্রিয়া আর মস্তিষ্কক্রিয়াকে পাভলভীয় মনোবিজ্ঞান এক করে দেখছে। মস্তিষ্কক্রিয়া ছাড়া মননক্রিয়া সম্ভব নয়, কিন্তু তাই বলে আমাদের চিন্তাভাবনা, ধারণা, চারিত্রিক দোষগুণ, উচ্চতর মনোবৃত্তি—কেবলমাত্র মস্তিষ্কের উত্তেজনা, নিস্তেজনা সম্ভূত ভাবলে ভুল হবে। মানসিক ও চারিত্রিক ধর্ম সামাজিক পরিবেশ-জাত; দেশ-কাল গণ্ডীদ্বারা সীমাবদ্ধ মানসিকতা। কি ধরণের সমাজে, কোন ধরণের কাজে আমরা নিযুক্ত আছি—তার দ্বারাই নিরূপিত হবে আমাদের মনোধর্ম ও চরিত্র।

মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য শুধু মনোধর্ম নিরূপণ নয়, মানসিকতা ও চরিত্রের পরিবর্তনই মনোবিজ্ঞানের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কাজেই আধুনিক মনোবিজ্ঞানীকে শুধু মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের সূত্র জানলেই চলবে না, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গতিপ্রকৃতির মূলসূত্রগুলিও ভালভাবে জানতে হবে। এছাড়া এপিষ্টেমোলজি বা জ্ঞানতত্ত্বেও তাঁর দখল থাকা চাই। সত্য-মিথ্যা নিরূপণ, বিভিন্ন তথ্য থেকে বস্তুজগতের আংশিক ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান আহরণ, তত্ত্ব ও প্রয়োগের সামঞ্জস্যবিধান, মনোবিজ্ঞানের আওতাতেই পড়ে।

প্রাকৃতবিজ্ঞানের সমমর্যাদাসম্পন্ন মনোবিজ্ঞান গড়ে তুলবার মালমশলা ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও পদ্ধতি আমরা পেয়েছি পাভলভের কাছ থেকে। তাই আজকের দিনে আর একবার আইভান পেত্রভিচকে স্মরণ করছি।

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬১।

মনের কথা

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

১॥ প্রস্তাবনা*

বাস্তব পৃথিবীর রক্তমাংসে গড়া বাস্তব মনুষকে বাদ দিয়ে চলতি কথায় আমরা যাকে বলি মানব-মন তার আলোচনা অবশ্যই অচল। কেননা, মন বলতে যাই বোঝাক না কেন তার কোন নিজস্ব সত্তা নেই, তা হাওয়ায় ভাসে না। কিংবা, যা একই কথা, শুধু মন বা নিছক মন—অর্থাৎ দেহহীন মন—বলে কিছুর কল্পনা যদি একান্তই করা যায় তাহলে তা নিয়ে আর যাই হোক বিজ্ঞানের আলোচনা সম্ভব নয়—হয়তো রোমহর্ষক ভৌতিক উপাখ্যান রচিত হতে পারে, কিংবা, অ্যালিস্ ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডের সেই গল্প যেখানে বেড়ালটা চলে যাবার পরও পড়ে রইল তার মেজাজ!

কথাটা সহজ। মানলাম। কথাটা মামুলি। মানলাম। কিন্তু যদি বলেন, মামুলি বলেই কথাটা আর নতুন করে পাড়বার তাগিদ নেই—তাহলে মাপ করতে হবে। কেননা, হাল আমলে এই কথাটি উপেক্ষা করেই মনস্তত্ত্ব নামে বিবিধ বিচিত্র মত প্রস্তাবিত হয়েছে এবং ভাবুক মনের কাছে তার মধ্যে অনেক মতই রোমাঞ্চর খোরাক হয়েছে। সেগুলির জটিল গোলক ধাঁধা থেকে বেরিয়ে বিজ্ঞানের পথ ধরে এগুতে হলে এই মামুলি কথাটিকেই সঙ্গী করা নিরাপদ। কেননা, মামুলি মানে, কথাটা আসলে সত্যি, তবে এত বেশী সত্যি, এমন প্রকটভাবে সত্যি, যে তা আজ সহজবোধের অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। অতএব কথাটা আর যাই হোক নিরাপদ; তাকে সঙ্গী করলে অন্তত রোমঞ্চকর আলেয়ার আকর্ষণে পথ-ভুলো হবার আশঙ্কা নেই। তাই এই সহজ কথাটি থেকেই শুরু করতে চাই; বাস্তব পৃথিবীর বাস্তব মানুষ ছাড়া মানব-মনের আলোচনা চলে না।

অতএব, প্রথম প্রয়োজন: রক্তমাংসে গড়া বাস্তব মানুষটিকে ঠিক মতো বোঝা। রক্ত-মাংসে গড়া এই কারণে বলছি যে, একথা মনে রাখলে ছুটি মূল বিষয়ে হুঁস থাকবে। এক: মানুষ আসলে বাস্তব পৃথিবীর একটি বাস্তব বস্তু; এবং পৃথিবীতে টিঁকবার জন্যে তার পক্ষে পৃথিবীর সঙ্গে কোন-একরকম সম্পর্কে আসতে হয়—কেননা বাঁচবার বা টেঁকবার সমস্ত রকম উপকরণেরই আকর এই পৃথিবী, বা, আরো নিখুঁতভাবে বললে বলা উচিত, বাস্তব প্রকৃতি বা বিশ্বসংসার। ছুই: মানুষ এই পৃথিবীরই অন্যান্য বহু জীবের মত একরকমের জীব, অন্যান্য বহু প্রাণীর মত একরকমের প্রাণী।

দ্বিতীয় কথাটি থেকেই শুরু করা ভাল। অন্যান্য প্রাণীর মত একরকমের প্রাণী হলেও অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে মানুষের তফাত আছে। কিসের তফাত? অর্থাৎ বাস্তব মানুষের আসল বৈশিষ্ট্য বলতে ঠিক কী? প্রথমতঃ শরীরের ঋজুভঙ্গী: মানুষ পায়ের উপর ভর দিয়ে সম্পূর্ণ সোজা ভাবে—খাড়া ভাবে—চলাফেরা করে; আর কোন জানোয়ার তা পারে না। দ্বিতীয়ত, এক জোড়া হাত: হাত বলে কোন অঙ্গ প্রাণীজগতে আর কোথাওই নেই। তৃতীয়ত, উন্নত মস্তিষ্ক: সমস্ত প্রাণীজগতের মধ্যে উন্নততম মস্তিষ্ক বলতে মানুষেরই। চতুর্থত, ভাষা: অন্যান্য সমস্ত জীবজন্তু চীৎকার করতে পারে এবং সে-চীৎকার বড় জোর সুখ-দুঃখ জাতীয় বেদনাঅনুভূতির পরিচায়ক; একমাত্র মানুষই কথা বলতে পারে—অর্থাৎ শব্দকে বাহন করে চিন্তার আদান-প্রদান করতে পারে। পঞ্চমত, সমাজ: অন্যান্য অনেক জানোয়ারেরই জীবন অবশ্য দলগত, কিন্তু একমাত্র মানুষই সুস্পষ্ট ও সচেতন নিয়মের ভিত্তিতে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্কে আসতে পারে।

মানুষের মূল বৈশিষ্ট্য বলতে এইগুলিই। এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলির ফলেই প্রাণীজগতে মানুষের শ্রেষ্ঠতা। নখের ধার, দাঁতের ধার, গায়ের জোর, বেগের ক্ষিপ্রতা প্রভৃতির দিক থেকে অনেক পশুর কাছেই মানুষের শক্তি নেহাত নগণ্য ; এবং শুধুমাত্র এ-জাতীয় শক্তির উপর নির্ভর করে যুঝতে হলে পৃথিবী থেকে মানুষ হয়ত কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত ! কিন্তু নিশ্চিহ্ন হওয়া দূরের কথা—অপরাপর শক্তির দিক থেকে তুলনায় অসহায় মানুষ তার বৈশিষ্ট্যগুলির শক্তিতেই প্রাণীজগতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, এর মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যই সনাতন নয়, খাপছাড়াও নও। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে মানুষের মধ্যে এই মূল বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমশ আবির্ভূত হয়েছে এবং প্রতিটির সঙ্গে প্রতিটির গভীর সম্পর্ক রয়েছে, প্রতিটির উপর প্রতিটির প্রভাব আছে, প্রতিটির উন্নতি অপরগুলিকে উন্নত করেছে।

বৈশিষ্ট্যগুলির আবির্ভাব-ইতিহাস থেকে এই পারস্পরিক সম্পর্কর কথা সুস্পষ্ট হয়। আবির্ভাব-ইতিহাস বলতে প্রাণীজগতের ক্রমবিকাশ। বহু কোটি বছর ধরে প্রাণীজগতে জটিল পরিবর্তন চলেছে, তারই সঞ্চিত পরিণাম হিসাবে আবির্ভাব হয়েছে নতুন নতুন প্রজাতির এবং তুলনায় সাম্প্রতিক এ-জাতীয় একটি প্রজাতি বলতে মানুষ। জীবতত্ত্ববিদ্‌দের কাছ থেকে এ-পরিবর্তনের একটা মোটামুটি হিসেব পাওয়া যায় : পৃথিবীতে মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর প্রথম আবির্ভাব পঞ্চাশ কোটি বছরেরও আগে, প্রায় চল্লিশ কোটি বছর আগে মাছের আবির্ভাব, সরিসৃপদের আবির্ভাব প্রায় পঁচিশ কোটি বছর আগে, স্তন্যপায়ীরা বিশ কেটি বছরেরও পুরনো ; তুলনায় মানুষের আবির্ভাব হয়েছে প্রায় দশ লক্ষ বছর আগে।

এই জটিল পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর বুকে যেমন নানা নতুন প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছে তেমনি আবার বহু বিচিত্র প্রাণীর পরিচয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। যে-আদিম বনমানুষের একজাতীয় বংশধরেরা বদলাতে বদলাতে শেষ পর্যন্ত মানুষ হয়েছে পৃথিবীতে আজ আর তারা টিঁকে নেই। কিন্তু তাদের অন্যান্য কয়েক রকম বংশধর আজো টিঁকে আছে। অতএব, প্রণীজগতের ইতিহাসে এরাই হল মানুষের নিকটতম আত্মীয়। কারা ? আধুনিক পৃথিবীর বনমানুষেরা : সিম্পাঞ্জী, গরিলা, ওরাং-ওটাং, গিবন। এদের মধ্যে মানুষের কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্যর কিছুটা আভাস দেখা যায়। তবুও অনেক তফাত। মানুষের কঙ্কাল আর গরিলার কঙ্কাল তুলনা করলে স্পষ্টই চোখে পড়ে, পায়ের উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার— অর্থাৎ শরীরের ঋজুভঙ্গির—কিছুটা পরিচয় গরিলার মধ্যে দেখা দিলেও এখনো তা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্বে আসতে অনেক বাকি। কিংবা, গরিলার থাবা আর মানুষের হাত পাশাপাশি দেখলে বোঝা যায়, কিছুটা মিল আছে—কিন্তু অনেক তফাত। আবার গড়ন আর আকারের দিক থেকে উভয়ের মস্তিষ্কের মধ্যে যেমন সাদৃশ্যটুকু উপেক্ষণীয় নয় তেমনিই গুরুত্বপূর্ণ হল পার্থক্যর দিকটি : মানুষের মস্তিষ্ক তুলনায় অনেক বড়, গড়নের দিক থেকে অনেক উৎকৃষ্ট।

আদিম বনমানুষদের অন্যান্য আধুনিক বংশধরদের সঙ্গে মানুষ বলে বংশধরটির পার্থক্য কেন ? কেননা, সেই আদিম বনমানুষদের একটি শাখা এক নতুন প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে নতুনভাবে যুঝতে শুরু করেছিল এবং তারই ফলে বহু বংশ উত্তীর্ণ হয়ে তাদের মধ্যে বহু পরিমাণগত পরিবর্তন সঞ্চিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত তা রূপান্তরিত হয় এই গুণগত পরিবর্তনে। অর্থাৎ, আদিম বনমানুষের ওই বংশধরেরা আর বনমানুষ রইল না, মানুষ হয়ে গেল : তার দেহভঙ্গি সম্পূর্ণ ঋজু, তার সামনের থাবা-জোড়া বদলে মানুষের হাত হয়ে গিয়েছে, তার মস্তিষ্ক হয়েছে উন্নততম, সে কথা কইতে শিখেছে আর শিখেছে সচেতন নিয়মের ভিত্তিতে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্কে আসতে।

---

* "মানব-মন" পত্রিকায় লেখক ধারাবাহিকতাবে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মনস্তত্ত্বর মূল সূত্র আলোচনার প্রস্তাব করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধ তারই সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধ।

বেদনারহিত সন্তান-প্রসব

ডাঃ রুদ্রেন্দ্র কুমার পাল

বহুদিন শুধু জনসাধারণই নয়, ডাক্তারদের মনেও ধারণা ছিল যে যথাসময়ে অর্থাৎ গর্ভধারণের দিন হইতে ৯ মাস দশ দিনের কাছাকাছি কোন সময়ে পর্যাপ্ত প্রসব বেদনা সুষ্ঠু সন্তান প্রসবের জন্য অপরিহার্য। পাকস্থলী, মূত্রাশয়, মলাধার প্রভৃতি ফাঁপা আন্তর যন্ত্রের পাঁচিলের পেশীগুলির ক্রমাগত সংকোচনের ফলেই সাধারণত বদ্ধ মুখটি খোলার জন্য ভিতরকার উপাদানের বহিষ্কার ঘটে ; এরূপ স্বাভাবিক নিয়ম পূর্ণ পরিণত ভ্রূণের প্রসব সম্বন্ধেও খাটে এবং তৎকালে বর্ধিতাকার জরায়ুর পাঁচিলের পেশীর সংকোচনের ফলেই প্রসূতির প্রসব বেদনা হইতে থাকে, ইহাই ছিল বহুকালের সংস্কার-জনিত বদ্ধমূল ধারণা। সে কারণেই, নেহাত কোন কারণে ফরসেপ্‌স প্রভৃতি যন্ত্র সাহায্যে প্রসব করানোর আবশ্যকতা না থাকিলে, ক্লোরোফর্ম, ইথার প্রভৃতি সাধারণ সংজ্ঞালোপক বা বেদনার হ্রাসকারক কোন ঔষধের প্রয়োগের রীতিও বিশেষ প্রচলিত ছিল না। শুধু জরায়ুগ্রীবার অতি দৃঢ়তা (rigid cervix) এবং জরায়ুর অত্যুত্তেজিতা (irritated uterus) প্রভৃতির জন্য যে-সকল স্থলে প্রসব বেদনা অত্যন্ত দুঃসহ হইয়া পড়িত, কেবল সেই সকল স্থলেই হায়োসিন সহ মার্ফিয়া (morphia with hyoscine) ইন্‌জেক্‌শনের দ্বারা ‘প্রদোষ নিদ্রা’র (twilight sleep) ফলে অত্যধিক বেদনার কতকটা উপশম করা হইত। অন্যান্য সকল স্থলেই আসন্নপ্রসবা যখন বেদনায় কাতরাইতে থাকিত, তখন ঠাকুমা, দিদিমা, মা, মাসী, পিসী সকলেই, এমনকি নার্স, দাই ও ডাক্তারও তাকে প্রবোধ দিয়া বলিতেন, “ব্যথা হওয়া ভাল, যত ব্যথা হইবে, ততই সহজে প্রসব হইবে ”।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পচিশ বছর পর্যন্ত প্রসব বেদনা-সম্বন্ধে এইরূপ ধারণাই বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু আজ আর সেই ধারণা নাই, কেননা পৃথিবীর বহু দেশের হাসপাতাল ও মাতৃসদনে এই যুগে বহু সন্তান, জননীকে ব্যথা না দিয়া কিংবা জননীর অত্যল্প ব্যথার মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিতেছে। এককালে যাহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ছিল, ‘বেদনারহিত সন্তান-প্রসব’ যাহা গল্পের মত শোনাইত, স্বর্গত মনীষী প্যাভ্‌লভের পদ্ধতির ভিত্তিতে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের সমবেত চেষ্টার ফলে, আজ তাহা ধ্রুব সত্য ও বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। এককালে কৃত্রিম উপগ্রহ, চন্দ্রে রকেটের হানা বা মহাকাশশূন্যে মানুষের বিচরণের কথা “আকাশ-কুসুম” বা অলীক কল্পনা ছিল, অথচ আজ ঐসকল তথাকথিত “অসাধ্য” অতি বিস্ময়কর হইলেও, মানুষের করায়ত্ত। ঠিক তেমনি “বেদনারহিত সন্তান-প্রসব” আজ আর বিজ্ঞানীর কল্পনা-বিলাসই নয়। আজ বিজ্ঞান অনিশ্চিত আশঙ্কাকাতর অসংখ্য সন্তানসম্ভবার মন হইতে সন্তান-প্রসবের বিভীষিকাকে দূর করিয়া আসন্ন মাতৃত্বের স্বর্গীয় আনন্দের সম্ভাবনাকে আরও মধুর ও প্রীতিকর করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের এইরূপ বিস্ময়কর অগ্রগতি ও ফলে মানব-সভ্যতার উজ্জ্বলতর উৎকর্ষের মূলে, সত্যসন্ধ, দ্রষ্টা ও শ্রেষ্ঠ সোভিয়েট বিজ্ঞানী প্যাভলভের যুগান্তকারী-অবদানের কথা পৃথিবী-চিরকাল কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিবে।

প্যাভ্‌লভ দুর্দান্ত জার-শাসিত রুশ দেশে জন্মগ্রহণ করেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর ঠিক মাঝামাঝিতে, ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি অক্লান্তভাবে তাঁহার শারীর বিদ্যা-সম্বন্ধীয় গবেষণার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি শল্যশাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন। কুকুরের পাকস্থলীর একাংশকে থলের আকারে (Pavlov's pouch) দেহের বহিরাংশে দৃষ্টিগোচরে স্থাপন করিয়া তিনি দেখিতে পান যে দুইভাবে পাচকাম্লরসের ক্ষরণ হইতে পারে, (১) খাদ্য যখন স্বাভাবিকভাবে মুখ ও খাদ্যনালী দিয়া পাকস্থলীতে প্রবেশ করে এবং (২) একটা নির্দিষ্ট খাদ্য গ্রহণ সময়ে, কিংবা মুখরোচক বা নাসারোচক খাদ্য দর্শনে কিংবা আঘ্রাণেও—অর্থাৎ খাদ্য মুখ দিয়া পেটে না গেলেও। তাই কেবল মানসিক কারণে পাকস্থলীর গ্ল্যাণ্ডগুলির যে ক্ষরণ দেখা যায়, তাহার তিনি নামকরণ করিলেন "মানসিক ক্ষরণ" (psychic secretion)। শুধু তাহাই নয়, অভ্যস্ত সময়ে খাদ্যগ্রহণ না করিলেও অভ্যস্ততা হেতু মানসিক ক্ষরণের সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীর পেশীর আপনি যে ক্ষুধা-জনিত সংকোচন (hunger contraction) হইতে থাকে—তাহা কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে শুধু কষ্টকরই নহে সময়ে সময়ে বেদনাকরও হইয়া পড়ে, তাহাও তিনি লক্ষ্য করেন। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে, তিনি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেন যে দেহের আন্তর যন্ত্রসংশ্লিষ্ট নার্ভগুলির (visceral nerves) মধ্যেই এমন কতকগুলি অন্তর্মুখ নার্ভতন্তু (afferent nerve fibres) আছে, যাহাদের দ্বারা ঐ আন্তর যন্ত্রগুলি হইতে উত্তেজনা সর্বদাই গুরুমস্তিকে (cortex) বাহিত হইতেছে। এই কারণেই আন্তর যন্ত্রগুলির অত্যধিক অস্বাভাবিক পেশীর সংকোচনের ফলে গুরুমস্তিষ্কের কেন্দ্রে বেদনা অনুভূত হয়। এইরূপ বেদনাবোধ যে গুরুমস্তিষ্কের ক্রিয়ারই অন্তর্গত,—বেদনা-সংশ্লিষ্ট সর্তাধীন পরাবর্তক্রিয়াকে (conditioned reflexes to pain) প্রাণীদেহে প্রবর্তনের দ্বারা প্যাভলভ-শিষ্য বীকোভ ও শোনিক (Bykov and Pshonik) গবেষণা ক্রমে প্রমাণিত করিয়াছেন। এই সকল গবেষণার ফলে সংবেশন বা অন্যপ্রভাবিত নিদ্রার দ্বারা দ্বিতীয় সংকেত নির্দেশক তন্ত্রের (second signalling system) উপর প্রভাববিস্তারের সাহায্যে বেদনা লোপ সম্ভবপর, এইরূপ প্রতীয়মান হয়।

জরায়ু হইতে বেদনাদ্যোতক উত্তেজনা সোজা পথে সমব্যথী নার্ভতন্তুজালও মহাধমনী সংশ্লিষ্ট নার্ভ তন্তুজাল এবং বাঁকা পথে আন্ত্রিক স্নায়ুতন্তুজাল, ভানুভবন হইয়া উভয় পার্শ্বস্থ ছয়টি নিম্ন অন্তঃপঞ্জর নার্ভ দ্বারা সুষুম্না কাণ্ডের পার্শ্বিক শৃঙ্গে এবং সেখান হইতে সমব্যথী নার্ভ পথে গুরুমস্তিষ্কের বিশিষ্ট কেন্দ্রে পৌছায়। জরায়ুর বেদনা-সংশ্লিষ্ট নার্ভপ্রান্তগুলি (pain receptors) ভগাস্থির উপরকার তলপেটে এবং কুঁচকির খাঁজের মধ্যে এবং জরায়ুগ্রীবার ঐরূপ নার্ভপ্রান্তগুলি যোনি ও গুহ্যদ্বারের মধ্যবর্তী অংশে, গুহ্যদ্বার, ত্রৈকাস্থিক ও নিতম্ব দেশে অবস্থিত। যখন কোনও কারণে, যেমন প্রসবকালে, জরায়ুর পেশীগুলির অত্যধিক প্রসারণ কিংবা অবিরাম সংকোচন হইতে থাকে তখন পেশীর এবং রক্তপ্রণালীগুলির উভয়ের উপর অতিরিক্ত চাপের ফলেই, আভ্যন্তরিক বেদনা গ্রাহক ইন্দ্রিয়স্থানগুলি উত্তেজিত হওয়াতে বেদনাবোধ জন্মে। কিন্তু নিকোলায়েভ মনে করেন যে এ ছাড়াও বেদনাবোধের অন্যান্য কারণও আছে, যেমন (১) তৎকালে কলাগুলির মধ্যে রাসায়নিক উপাদানগুলির অস্বাভাবিক পরিবর্তন, (২) গুরুমস্তিষ্কে ও তন্নিম্নাংশে পারস্পরিক আবেগ (reciprocal induction) সংঘটনে বিঘ্ন (৩) সর্তাধীন পরাবর্ত ক্রিয়া (conditioned reflexes) প্রভৃতি। এইগুলির দ্বারা দ্বিতীয়ের সঙ্গে সর্বদাই প্রথম সংকেত নির্দেশক কেন্দ্রের যোগাযোগ সাধিত হয়। সুতরাং নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে, নিম্ন অংশ (subcortex) নহে, গুরুমস্তিষ্কই প্রসবকালীন বেদনা-বোধের জন্য মুখ্যতঃ দায়ী। প্যাভলভের মতে এ সমস্তই নিয়ন্ত্রিত হয় গুরুমস্তিষ্কের দ্বারা এবং যে সকল অনুভূতিগুলি মানব দেহের পক্ষে অতীব সার্থক, কেবল সেইগুলিরই অনুভূতি ঘটায়।

নিকোলায়েভের মতে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশিষ্ট কারণই প্রসব বেদনার জন্য দায়ী, যথা—

(১) যথাসময়ে পূর্ণ পরিণত ভ্রূণের বহিষ্কারের জন্য জরায়ুর পেশীর সংকোচন হেতু, নার্ভপ্রান্তগুলির

উপর চাপ (২)' জরায়ুর বন্ধনীগুলি (ligaments) এবং আবরক পেরিটোনিয়ামের প্রসারণ হেতু টান (৩) জরায়ুর অসংখ্য রক্তপ্রণালীর উপর টান ও চাপ (৪) প্রসবের প্রথম পর্যায়ে অসংখ্য নার্ভতন্তুজাল-সমন্বিত জরায়ু-গ্রীবামুখের প্রসারণ ও বিকোচন, এবং (৫) বস্তির মেঝে, যোনিদেশ, যোনি ও গুহ্যদ্বারের মধ্যবর্তী স্থান এবং প্রসবপথের অন্যান্য অংশের উপর প্রসবের দ্বিতীয় পর্যায়ে চাপ। এই কারণগুলি সকল প্রসূতিরই প্রসবকালে কমবেশি বিদ্যমান থাকিলেও বেদনাবোধক অনুভূতির পার্থক্য হেতু কোন কোন স্বাভাবিক প্রসবকালে অতি অল্পই ব্যথা অনুভূত হয়। কেহ কেহ আবার শান্ত ও সংযতভাবে প্রসব বেদনা সহ্য করিয়া যায়, কারণ দ্বিতীয় সংকেততন্ত্রের প্রাধান্যহেতু উত্তেজনা ও অবতেজনার সামঞ্জস্যের ফলে, তাহাদের গুরুমস্তিষ্ক ও তন্নিম্নাংশের পারস্পরিক সম্পর্ক অব্যাহত থাকে। কিন্তু যাহাদের সেইরূপ সহগুণ নাই, তাহারাই ঠাকুমা, দিদিমা, মা-মাসী-পিসীদের মুখে অসহ্য প্রসব বেদনার কথা শুনিতে শুনিতে অভ্যস্ত হইয়া যথাসময়ের পূর্বেই প্রসব-বেদনার আতিশয্যের ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া থাকে। ইহারই ফলে দ্বিতীয় সংকেত তন্ত্রের অপকর্ষহেতু, প্রসবকালে তাহারা অত্যন্ত চঞ্চল ও ভীতিবিহ্বলভাবে হাত-পা ছুঁড়িতে থাকে এবং অকারণে অত্যধিক বেদনা অনুভব করে। এইরূপস্থলে গুরুমস্তিষ্কে নিম্নবর্তী স্থান হইতে তীব্র উত্তেজনাস্রোত উপরে উঠিতে থাকে বলিয়া, গুরুমস্তিষ্ক বেদনাকে হ্রাস করার পরিবর্তে নিজেই ঐ উত্তেজনায় সাড়া দিয়া বেদনাবোধকে তীব্রতর করিয়া তোলে। সময়ে সময়ে যথাযথ ব্যথার অভাবে শীঘ্র সন্তান প্রসব হয় না,—এইরূপ ভ্রমাত্মক ধারণার বশে অদূরদর্শী ও দায়িত্বজ্ঞানহীণা ধাত্রী ও আনাড়ী ডাক্তারও সন্তান প্রসবের জন্য এইরূপ তীব্র বেদনা অপরিহার্য, এইরূপ যুক্তি প্রসূতির মনে ঢুকাইয়া, সন্তান প্রসবকালে উপযুক্ত সাহায্য দানের পরিবর্তে, সন্তান প্রসবকে দুরূহ ও দুর্বিসহ করিয়া থাকে। মানবদেহে দ্বিতীয় সংকেততন্ত্রের মুখ্য ভূমিকাসম্বন্ধে মতদ্বৈধের কোন কারণ নাই। সেই জন্যই বেদনারহিত সন্তান প্রসবের পূর্বে প্রসূতির মন হইতে অহেতুক ভয়ের কারণ দূর করা অত্যাবশ্যক।

প্রাক্‌প্রসব কালে একদিকে মন হইতে বেদনার আশঙ্কাকে দূর করা এবং অপরদিকে একটি ফুলের মত সুকুমার সন্তানলাভের আনন্দকর প্রত্যাশা জাগানোই, বেদনারহিত সন্তান-প্রসব ব্যবস্থার দুইটি বিশেষ অংশ। সংবেশন-সাহায্যে বা ইচ্ছার প্রভাবে ঘুম পাড়াইয়া কিংবা ঔষধের প্রভাবে সংজ্ঞা লোপ করিয়া বেদনার উপশম করা, ইহার উদ্দেশ্য নয়। প্রাক্‌প্রসবকালে যথাযথ মানসিক প্রস্তুতির দ্বারা প্রসব বেদনার প্রতিষেধ বা উপশমই ইহার লক্ষ্য।

নঞ্‌র্থক প্রক্ষোভই (negative emotions) স্বাভাবিক প্রসবকালে বেদনার মুখ্য কারণ। সেই জন্য প্রসবের পূর্বে প্রসূতির সম্যক মানসিক প্রস্তুতি এই চিকিৎসা-পদ্ধতির ভিত্তিমূল। অহেতুক আশঙ্কা ও নঞ্‌র্থক প্রক্ষোভকে প্রসূতির মন হইতে দূর করিয়া, সন্তান-প্রসব মল বা মূত্র ত্যাগের মতই একটি অতি স্বাভাবিক দৈহিক ব্যাপার, এইরূপ ধারণা জন্মানো অত্যাবশ্যক। ভয়ের কারণ বা বিষয় কি, না জানিয়া আশঙ্কা বা চিত্তচাঞ্চল্য, ভয়ের বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জানিয়া শুনিয়া আশঙ্কার চেয়ে, সর্বদাই অধিকতর ভয়াবহ। এই হিসাবে বনের বাঘের অপেক্ষা মনের বাঘই বেশী ক্ষতিকর, কারণ বনের বাঘের সঙ্গে বন্দুক হাতে লড়াই করা চলে, কিন্তু মনের বাঘের সঙ্গে সেরকম কিছু করিবার কোন উপায়ই নাই। তাই প্রসূতির মনের বাঘকে অর্থাৎ তাহার মনের অহেতুক ভয়কে দূর করাই সর্বাগ্রে আবশ্যক।

হাসপাতাল বা প্রসূতিসদনের মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রগুলিতে, প্রসবকালের চারি বা পাঁচসপ্তাহ আগে হইতে, তিন চারিদিন পরে পরে অভিজ্ঞ চিকিৎসক বা ধাত্রী, মডেল, ম্যাজিক লণ্ঠন, বা চলচ্চিত্রের সাহায্যে প্রসূতিদের নিকট গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া গর্ভস্থ ভ্রূণের মাতৃগর্ভে বৃদ্ধি সম্বন্ধে সবকিছু বুঝাইয়া বলা হয়। তাহার পূর্বে অবশ্য তিনি প্রসূতিকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া, তাহার শারীরিক অবস্থা, পেলভিসের মাপজোক

এবং অন্যান্য লক্ষণীর সব কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন এবং অতি ঘরোয়াভাবে প্রসূতির সঙ্গে সহানুভূতির সহিত কথাবার্তা বলিয়া সন্তান প্রসব সম্বন্ধে তাহার মনের ভয় দূর করিতে চেষ্টা করেন।

প্রথম বক্তৃতার বিষয় হয়, মেয়েদের বহিঃস্থ ও আভ্যন্তরিক যৌন অঙ্গগুলির সংস্থান ও ক্রিয়াসম্বন্ধে আলোচনা; তৎপরে গর্ভাধান ও গর্ভস্থ ভ্রূণ কি করিয়া মাতৃশোণিতে গর্ভফুলের মাধ্যমে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া বাড়িতে থাকে তাহাও বুঝাইয়া বলা। ঐ সঙ্গে তিনি প্রসূতির মন হইতে সন্তান প্রসবের জন্য প্রসব বেদনা অপরিহার্য, এরূপ ধারণা যে ভুল, সে সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা করেন।

দ্বিতীয় বক্তৃতায় চিকিৎসক বা ধাত্রী ঐ একইভাবে সন্তান প্রসবের প্রথম পর্যায় (First stage of labour) সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং ঐ সময়ে কিভাবে জরায়ুর পেশীর সংকোচন ও জরায়ুগ্রীবামুখের প্রসারণ বেদনা ছাড়াই হইতে পারে তাহাও বুঝাইয়া বলেন এবং ঐ উদ্দেশে প্রসূতির পক্ষে বেদনা উপশমের কয়েকটি প্রক্রিয়া; অর্থাৎ প্রত্যেকটি বেদনার আবির্ভাবের সঙ্গে পর্যাবৃত্ত শ্বসন এবং প্রত্যেকটি প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাসকালে ভগাস্থির ঠিক উপরে, তলপেটে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ সাহায্যে মালিশ করা, বুড়ো আঙ্গুলের দ্বারা পেলভিসের পশ্চাৎদিকে ত্রিকাস্থির ও পার্শ্ববর্তী চ্যাপটা হাড়ের সংযোগস্থলে উপরের দিকে চাপ দেওয়া, অথবা হাতকে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় কিংবা রোলার-সাহায্যে পাছার উপর চাপ দেওয়া, প্রভৃতি সম্বন্ধে যথাযথ নির্দেশ দেন।

তৃতীয় বক্তৃতার বিষয় হয়, সন্তান প্রসবের দ্বিতীয় পর্যায় বা গর্ভস্থ ভ্রূণের বহিষ্কার। ঐ সময়ে প্রসবকল্পে শ্বাস বন্ধ করিয়া কীভাবে কোঁত্ দেওয়ার প্রয়োজন, তা বুঝাইয়া বলেন চিকিৎসক বা অভিজ্ঞা ধাত্রী, এবং নিজে সেইভাবে শ্বসন করিয়া প্রসূতিকে দেখাইয়া দেন ও তাহার পুনরাবৃত্তি অভ্যাস করিতে বলেন। নাক ও মুখের সম্পূর্ণ বন্ধ অবস্থায়, কুড়ি সেকেণ্ডের মত কাল শ্বসনরহিত ভাবে বিশেষ দেহসংস্থানে কোঁত দেওয়া যথাযথভাবে বারবার অভ্যাস করানো হয় এবং তাহার মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মানো হয় যে এরকম করিলে বেদনার উপশম হইবেই হইবে।

চতুর্থ বক্তৃতায় প্রসবের তৃতীয় পর্যায় অর্থাৎ গর্ভফুলের বহিষ্কার সম্বন্ধে বুঝাইয়া বলা হয় এবং ঐ সঙ্গে বেদনা-উপশমী প্রক্রিয়াগুলি ঠিকমত অভ্যস্ত হইয়াছে কি না তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। আরও বলা হয়, যে সুমাতৃত্ব মেয়েদের পক্ষে একটি অতি আনন্দময় অবস্থা—তাহাতে জীবনের মূল্যবোধ অনেক বাড়িয়া উঠে এবং প্রসূতির মনে ভয় চাঞ্চল্যের পরিবর্তে এক অনির্বচনীয় পুলকের আবেশ জাগিয়া উঠে।

এই সকল বক্তৃতার কালে বেদনারহিত প্রসব-অভিজ্ঞ অন্যান্য প্রসূতিদের সঙ্গে আসন্ন প্রসূতিদের মেলা-মেশার ব্যবস্থা করিতে পারিলে খুবই ভাল হয়, কারণ ঐরূপ ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার ফলে, তাঁহাদের মুখে, সন্তান-প্রসব ব্যথা কিছুই নয়, এই রকম শুনিতে শুনিতে তাহারও বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করে যে সন্তান-প্রসব সত্যসত্যই প্রাণান্তকর ত নয়ই, এমনকি কষ্টকরও কিছু নয়।

এইস্থলে প্রশ্ন জাগিতে পারে, এই পদ্ধতিতে প্রসবকাল বিলম্বিত হয় কি? এই বিষয়ে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী ফির্গানোভ বলেন, তাতো হয়ই না, বরং দেখা গিয়াছে যে অনেকস্থলে প্রথম প্রসূতির প্রসবকালে, প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় ইহাতে ত্বরান্বিতই হইয়াছে, এবং এই পদ্ধতিতে প্রসবের পর যোনি ও গুহ্যদ্বারের অন্তর্বর্তী অংশের (perineum) ছিন্নীকরণও অনেকটা কমই হয়। বেদনা প্রতিরোধক এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ মানসিক ও দেহের পক্ষে স্বাভাবিক (psychologic and physiologic) বলিয়া ইহাতে কী প্রসূতি কী প্রসূত কাহারও পক্ষে কোন অনিষ্ট হওয়ার কথা নয়। এমনকি হৃদ্‌রোগিনী প্রসূতির পক্ষেও, যখন সংজ্ঞালোপক ঔষধ প্রয়োগে অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী, তখনও এই পদ্ধতিতে রোগিনীর কোন আনিষ্টই হয় না এবং অতি সহজে সুস্থ সন্তান প্রসব সম্ভবপর। কিন্তু এ কথা মনে রাখা উচিত যে

অস্বাভাবিক নানা গর্ভাবস্থার কথা ছাড়িয়া দিলেও, সকল স্বাভাবিক প্রসবকালে প্রসব বেদনা রহিত নাও হইতে পারে। ইহার সফলতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে প্রসূতির প্রাক্‌প্রসবকালীন প্রস্তুতির উপর। চিকিৎসক এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ না হইলে এবং প্রসূতির মনের উপর নিজের প্রভাব বিস্তারে অক্ষম হইলে, প্রসূতি অত্যন্ত ভীতু বা দুর্বল চিত্ত হইলে, হাসপাতাল বা প্রসূতিসদনের ব্যবস্থা যথাযথ না থাকিলে, কিংবা গৃহে অতি সহানুভূতিসম্পন্না "আহা—উহু" করার মত ঠাকুমা, দিদিমা প্রভৃতি থাকিলে, এ পদ্ধতিতে আশানুরূপ ফললাভ কখনই সম্ভবপর নহে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের মতে, তিনভাগের দুইভাগ স্থলেই এই পদ্ধতি ফলপ্রসূ। বাকী এক তৃতীয়াংশে বিশেষতঃ অতি বিলম্বিত প্রসবস্থলগুলিতেই এইরূপ বিফলতা দেখা যায়। সুতরাং প্রয়োজন হইলে, ঐ সকল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সুপরিচিত বিশেষ বিশেষ বেদনালোপক ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া উচিত। মর্ফিয়া ও হায়োসিনের কথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্তমানে কডিন বা ইউকেডল সহ সালফেনিল অ্যামাইড বা প্রমেডোল সহ কডিন, একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। প্রসবের দ্বিতীয় পর্যায়ে কোন কোন স্থলে ০·৫% নভোকেন, ০·০৫% লুপিকেন বা ০·১% অ্যানিকেন দ্রব ইন্‌জেকশনের দ্বারা পিউডেনডেল নার্ভকে নিঃসংজ্ঞ করিয়া অত্যধিক বেদনার উপশমও করা যাইতে পারে। প্রসব পথের তুলনায় ভ্রূণের মস্তক আকারে বড় হইলে, অল্পক্ষণের জন্য ইথার বা নাইট্রাস অক্সাইড সাহায্যে সংজ্ঞালোপের ব্যবস্থাও চলিতে পারে। প্রসবকালে কোন অস্বাভাবিকতা হেতু যেমন, জরায়ুর শিথিল অবস্থা, জরায়ুর নিষ্ক্রিয়তা, অকালে ভ্রূণের ঝিল্লী আবরণ ছিন্ন হওয়া, প্রভৃতির জন্য সাময়িক সংজ্ঞালোপের সঙ্গে সঙ্গে, (কেবল জরায়ু গ্রীবামুখের দুই আঙ্‌ল পরিমিত প্রসারিত অবস্থায়, নচেৎ নহে) পিটুইট্রিন বা অক্সিটোসিন প্রয়োগও আবশ্যক হইতে পারে।

১৯৫৫ সালের জুলাইমাসে সোভিয়েট অ্যাকাডেমি অব্‌ সায়েন্সের বিশেষ নিমন্ত্রণে যখন সোভিয়েট দেশে গিয়াছিলাম, তখন মস্কো ও লেনিনগ্র্যাডের কয়েকটি হাঁসপাতালে, কী ভাবে প্রাক্‌প্রসবকালে প্রসূতিকে পরবর্তী সময়ে ঐ বিশেষ ঘটনার জন্য প্রস্তুত করা হয়, তাহা দেখিবার, একটি স্থলে প্রসবকালে উপস্থিত থাকার, এবং অপর একজন প্রসূতিকে সন্তান প্রসবের পর জিজ্ঞাসাবাদ করার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। সুতরাং বেদনারহিত সন্তানপ্রসব-ব্যবস্থা আমার কাছে মাত্র শোনাকথা কিংবা বইতে পড়া বিষয় নহে, প্রত্যক্ষ ব্যাপার। তৎকালে আমার হাতে সচিত্র সাপ্তাহিক "সোভিয়েট ইউনিয়ন"এর ৬নং (৬৪), জুন, ১৯৫৫ সংখ্যা দেওয়া হয়। তাহাতে অল্‌গা নিকোনচিক লিখিত "A child is born" নামক বেদনারহিত প্রসব-সম্বন্ধে সাধারণের বোধগম্যভাবে বিভিন্ন ব্যবস্থার চিত্রসহ একটি সুন্দর প্রবন্ধ আছে। সামারা ভল্‌কোভা নামে একটি কলেজ ছাত্রীর এই পদ্ধতিতে প্রসূত সন্তানকে স্বর্গীয় হাসিতে প্রোজ্জ্বলমুখে স্তন্যদানের যে চিত্রটি আছে, তাহা দেখামাত্র বহু প্রসূতিরই মনের ভয় আপনি কাটিয়া যাইবে। আর ঐ প্রবন্ধের শেষের দিকে আছে ভিজিটিং কার্ডের এবং তৎসহ পত্রের ডাকের মোহর সহ শিরোনামার প্রতিচ্ছবি। তাহার উপরে যাহা বিদেশী ভাষায় লেখা আছে, তাহার অনুবাদিত সারমর্ম দাঁড়ায় ঃ— ফরাসী শহর মার্সেলের ব্ল্যাঁ (Blanch)-পরিবারের যে ভিজিটিং কার্ডখানা "সোভিয়েট ইউনিয়ন" পত্রিকা সম্প্রতি পাইয়াছে তাহাতে লেখা আছে, "অতীব আনন্দের সঙ্গে শ্রীমতী ও রোজার ব্ল্যাঁ তাদের একটি কন্যাসন্তান মিরেলের জন্ম সংবাদ জানাচ্ছেন" আর ঐ সঙ্গে দ্বিতীয় কার্ডে লেখা আছে "১৯৫৫ সালের ২৩শে মার্চ আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সোভিয়েট বিজ্ঞানের প্রভাবে এবং বেদনারহিত সন্তান-প্রসবের পদ্ধতিতে আস্থাবান সৎসাহসী কয়েকজন একনিষ্ঠ চিকিৎসকের সুব্যবস্থায় আমি আমার জননীকে কোন ব্যথার কষ্ট না দিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমি আপনাদিকে বোঁজুর (সুপ্রভাত) ইচ্ছা করি। মিরেল ব্ল্যাঁ।"

এমনি শুধু সোভিয়েট দেশেই নহে পৃথিবীর অন্যান্য প্রগতিশীল দেশে বহু সন্তানই প্রসবকালে জননীর ব্যাথার কারণ না হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। আমাদের দেশেও তাহা সম্ভবপর। ইতিমধ্যেই নাকি দু'একটি স্থলে এই পদ্ধতিতে সাফল্যের সঙ্গে সন্তনে প্রসব সম্ভবপর হইয়াছে। বন্ধুবর ডাক্তার ধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় নিজেও নাকি এরূপ একটি ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এইরূপ শুনিলাম।

মনুষ্য সমাজের এই মহৎ উপকার সাধনের জন্য, শুধু চিকিৎসা-জগৎই নয়, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোটি কোটি প্রসূতি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিবে, সত্যদ্রষ্টা সোভিয়েট বিজ্ঞানী প্যাভলভের কাছে। আমরাও এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার পবিত্র স্মৃতির প্রতি কৃতজ্ঞ চিত্তে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

"ভয়াবেগের বৈশিষ্ট্য হল মস্তিষ্কের উপস্তরের (Subcortex) আনুষাঙ্গিক কেন্দ্রগুলিতে উত্তেজনাসৃষ্টি। নঙর্থক উপগমের নিয়ম অনুযায়ী ভয়াবেগ মস্তিষ্কের ত্বকের সদর্থক মূর্ছনাকে নমিত করে এবং তাকে কিছুটা দমিত অবস্থায় স্থাপন করে। এর ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্ধিত অভিভাবের প্রাক্-প্রবণতা দেখা দেয়। মস্তিষ্কের উপস্তর থেকে উদ্ভূত প্রক্ষোপজনিত উত্তেজনা মস্তিষ্কের ত্বকের সদর্থক মূর্ছনাকেই কেবল নমিত করেনা সেই সঙ্গে তার বেদন-বিশ্লেষকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রটিকেও "আহিত" "(charges)" করে (প্যাভলভের ভাষায়) এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ বেদনার একটা ভাব উদ্রিক্ত করে। এ থেকেই অস্তিত্বহীন বেদনার (মনোজাত বেদনার) বাস্তব সংবেদনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এই একই ভাবে সত্যকার বেদনাও তীব্রতর হতে পারে।"

—কে, প্লাটোনভ

বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মহাশূন্যের জ্যোতিষ্কের মত আমরা প্রচণ্ডবেগে অবস্থান কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে সরে যাচ্ছি। পুরণো মূল্যবোধ ভেঙ্গে পড়ছে। নতুন মূল্যবোধ গড়ে উঠছে না। বিরোধী কার্যকলাপ ও অস্বাভাবিক চিন্তাভাবনা মানুষকে অস্থির করে তুলেছে। ধর্ম, কর্ম, মন্ত্রতন্ত্রের রক্ষাকবচ যন্ত্রযুগের ভূতপ্রেতকে তাড়াতে পারছে না। মন্দির. মসজিদ, গীর্জার চত্বরে ভীড় বাড়ছে বটে, কিন্তু আশ্রয় মিলছে না। অজস্র প্রশ্ন জাগছে, উত্তর দেবার গুরুদেবের অভাব। সমস্যা অনেক, সমাধানের ইঙ্গিত নগণ্য।

এ অভিযোগ আজকের নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিকদের মনে এ অভিযোগ জমে উঠছে দেখতে পাই, আজকে এর প্রাবল্য ও বিস্তৃতি দুইই বেশী।

সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিকদের লেখায় প্রায়শই দেখতে পাচ্ছি এই ধরণের বিলাপ—সমাজজীবন ও ব্যক্তি-জীবনে নিদারুণ সঙ্কট দেখা দিয়েছে, বিচ্ছিন্নতা ও শূন্যতাবোধ ব্যক্তিকে জীবনবিমুখ করে তুলেছে, মানবিক সম্পর্ক দুষিত হয়েছে, পারিবারিক সম্পর্কে ভাঙন ধরেছে, সামাজিক ও নৈতিক মান নেমে এসেছে, মানবিকতার মর্য্যাদা ছেড়ে দ্রব্য ও অর্থের মর্য্যাদাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।

শিল্পে সাহিত্যে এরই অনুরণন। টি, এস, এলিয়ট লিখেছেন, "And now you live dispersed... And no man knows or cares who is his neighbour ! আর এক জায়গায়, "Do you know—it no longer seems worthwhile to speak to anyone. No it is not that I want to be alone. But that everyone's alone—Or so it seems to me." সম্প্রতি গল্প উপন্যাসের নায়কদের মধ্যে তাই বারবার 'আউট-সাইডার'এর দেখা মেলে। কলিন উইলসন বলেছেন এই 'আউটসাইডার' জীবনের ফাঁকি ধরে ফেলেছে। সামঞ্জস্যহীন জীবন—শৃঙ্খলা নেই জীবনে !

বারবুসের লা' এনফার-এর নায়ক তাই একটা হোটেলের ঘরে, জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, একটা ছোট্ট ফোকরে চোখ রেখে চলমান জগতের দিকে তাকিয়ে আছে। এইভাবেই নাকি সে জীবনকে সত্যিকারের উপলব্ধি করতে পারছে। সে দেখছে বিশৃঙ্খলা···আর ছন্দপাত ! আনন্দ নেই, নেই ভবিষ্যৎ। এইচ, জি, ওয়েলস্-এর "Mind at the End of its Tether" এও সেই একই সুর ধ্বনিত হয়েছে..."The end of everything we call life is close at hand and cannot be evaded !" আলবার্ট কামুর 'লা' এসট্রেনজারে, হেমিংওয়ের প্রথমদিকের লেখায় সেই একই কথা :—শূন্যতা, বিচ্ছিন্নতা,···আর মনের বিক্ষিপ্ততা ! জঁা পল সার্ত্রের একটি গল্পের নায়ক রোকোয়েনটিন-এর ভাষায় বলা চলে,—The nausea is not inside me ; I feel it out there, in the wall, in the suspenders ; everywhere around me. It makes itself one with the cafe ; I am the one who is within it." পচন ধরেছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে···দুর্গন্ধে বমনোদ্রেক হওয়াই তো স্বাভাবিক !

আমাদের দেশের সাহিত্যেও হালে এই ধরণের চরিত্র আমদানির চেষ্টা চলেছে এবং চেষ্টাটা চলছে প্রগতিবাদের নামে, নতুনত্বের অজুহাতে !

ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধ যে ঘটেছে ও সমাজমানস থেকে ব্যক্তিমানস ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে—এনিয়ে দ্বিমত নেই। খণ্ডিত সত্তার প্রতিফলন দেখছি শুধু সাহিত্যিকদের লেখায় নয়, মানুষের জীবনেও দ্বন্দ্ব ও বিরোধিতা উগ্রভাবে দেখা দিয়েছে।

একদিকে সমাজজীবনে বিরাট সম্ভাবনা ও সাফল্যের ইঙ্গিত সূচিত হচ্ছে, অন্যদিকে অসাফল্য ও নৈরাশ্যবোধ ব্যক্তিমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। নিউরোটিক ও সুইসাইডের সংখ্যা দ্রুত-বর্ধমান। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা অঙ্গীকৃত হলেও, থাকছে অলভ্য রাজ্যে। তাই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ব্যক্তি সমাজজীবন থেকে। সবকিছু ভেঙ্গে ফেলতে চাইছে অন্ধ বিদ্রোহের নেশায়, অথবা সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। আর না হয় উন্মাদ আশ্রমের অতিথি হিসেবে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস করছে।

দার্শনিক মহলে সাড়া জেগেছে। অস্ত্রে শান দিয়ে নতুন লড়াই-এর জন্য সবাই প্রস্তুত। লক্-শিষ্য পজিটিভিষ্টরা ম্যাক্-এর দেউলিয়া যুক্তি নতুন ক'রে হাজির করছেন। একশো বছরের পুরানো কিয়েরকেগার্ড এর রহস্যবাদকে জেসপার, সার্ত, মারসেল; কামু এঁরা এক্সজিস্টানসিয়ালিজম্-এর নামে হাজির করছেন।

এরাই সব থেকে বেশী সক্রিয়।

“আমি আছি”—শুধু এইটুকুই সত্য আর সব ধোঁয়া। বিচার বিবেচনা, কার্যকারণ-সম্পর্ক নির্ণয়—এরা বলছেন—অর্থহীন। জাগতিক সবকিছু বর্তমান সমাজবুদ্ধির অগম্য, রহস্যময়। মানবিক সম্পর্কের উন্নতি এঁরা চান না, কেননা সেটা অসম্ভব, মানুষ তো বিচ্ছিন্ন হয়েই আছে, বলতে গেলে শত্রুপুরীতেই বাস করছে। সমাজ আর রাষ্ট্রের দাপটে ব্যক্তিত্ব খণ্ডিত হচ্ছে, ব্যাহত হচ্ছে। এ বিচ্ছিন্নতার তরঙ্গ রোধিবে কে ? পারমানবিক যুদ্ধরোধের প্রয়োজনই বা কি ? মরতে শেখাই এই অস্তিত্ববাদীদের জীবনদর্শন। কামুর ভাষায়, “Death and the absurd are here the principles of the only reasonable freedom”.

ধর্মধ্বজীদের মধ্যেও চাঞ্চল্য জেগেছে। ধর্মরাজ্য পুনস্থাপনের আশায় এরা মেতে উঠেছেন। নতুন ধর্ম, নতুন দুর্গ গড়বার আশায় পশ্চিমী পণ্ডিতগণ ইষ্টার্ণ মিষ্টিকদের জীবনী লেখায় মনোনিবেশ করেছেন। বিজ্ঞানযুগের মিথ্যা অভিমান ছাড়বার জন্যে মানুষকে পরামর্শ দিচ্ছেন। যন্ত্র ছেড়ে আবার তন্ত্র-মন্ত্রের যুগে ফিরে যাওয়া কি সম্ভব ? গেল কয়েক বছরে ওদেশে ক্যাথলিক পার্টিগুলির প্রভাব বেড়েছে। এদেশে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পানাকাঙ্ক্ষীর ভীড়ও বেড়েছে নিঃসন্দেহ। কিন্তু তবুও তো কমছে না নিউরোটিক সুইসাইডের সংখ্যা। মনের ভাঙন ও বিচ্ছিন্নতা রোধ করা যাচ্ছে না। জীবন তৃষ্ণা মিটছে না। নীতিবোধ ও মানবিকতাবোধের উন্নতি হচ্ছে কোথায় ? কালোবাজারী ও ঘুষখোরের আধিপত্য সমানে বেড়ে চলেছে. আর তেমনি বেড়ে চলেছে একচ্ছত্র পুঁজিবাদের ব্যাদান বিস্তার। সেই বিস্তার সঙ্কুচিত করার ব্যবস্থা অনেক রাষ্ট্রের সংবিধানে থাকলেও, তাকে কাজে লাগান যাচ্ছেনা। দেখা যাচ্ছে যে সব বিধিবিধান ও প্রতিষ্ঠান একযুগের জনকর্ম ও অভ্যাসকর্মের ওপর গড়ে উঠেছিল, এযুগের সমস্যা সমাধানে তারা অপারগ। এ যুগের মানবিক সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতা রোধ করতে তারা অক্ষম।

হাহাকার ছেড়ে এবার প্রতিকারের কথায় আসা যাক্। রোগের কারণ নির্ণয় তার আগে দরকার। উনিশ শতকে এমনকি বিশ শতকের গোড়ার দিকেও বুদ্ধিজীবীরা (যখন অস্তিত্ববাদ ও নির্জ্ঞানতত্ত্ব দ্বারা পুরোপুরি আচ্ছন্ন হননি) এই বিচ্ছিন্নতাবোধকে ব্যক্তিগত দুর্বলতা বা অসুস্থতা বলে মনে করতেন। শীলার. কোলরিজ বা শেলীকে ব্যতিক্রম বলেই ধরা হোত। ভ্যানগগ একটা বৈচিত্র। সাধারণ মানুষ এমন হয় না। কিন্তু ক্রমশঃ এই রোগের

বিস্তার ঘটতে লাগল। বিশেষ করে, প্রথম মহাযুদ্ধ মানুষের নীতিবোধকে দিল বেশ বড় রকমের নাড়া। ঠিক এমনি সময় ফ্রয়েডীয় 'নির্জ্ঞান মনের' তত্ত্ব ইউরোপ থেকে আমেরিকায় আমদানী হয়েছে। সেখানকার মনস্তাত্ত্বিকেরা জেমসের 'মানসিক অন্দরমহলের' আধুনিকতম সংস্করণ হিসাবে 'নির্জ্ঞান তত্ত্ব'কে বরণ করে নিলেন। ডলারপুষ্ট ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব ইউরোপে পুনঃরপ্তানী হয়ে ভাল বাজারই পেল। যুদ্ধের, নৃশংসতার, জিঘাংসার, ঈর্ষা-দ্বেষের কারণ তাঁরা জানলেন—লুকিয়ে আছে মানুষেরই মনের গভীরে। মানবিক সম্পর্কবোধ আসলে সভ্যতার একটা বাহ্যিক আবরণ মাত্র! আত্মকেন্দ্রিক প্রবৃত্তি-সর্বস্ব মানুষকে কতটুকুই বা সামাজিক করা যায়! সামাজিককরণের মূল্য আবার নিউরোসিস! অসম্ভব এই নির্জ্ঞান মনের দুর্বার প্রবৃত্তিকে বাঁধ দিয়ে আটকাবার চেষ্টা। ক্যানিউট-এর সাগরতরঙ্গ রোধের চেষ্টার মতই হাস্যকর। নিউরোটিক, সুইসাইড ও সমাজদ্রোহীর দল নতুন করে নিজেদের বুঝতে শিখল ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের দৌলতে! "It is human nature that is wrong, not me!"—ভাবল তারা। বেশ একটা আত্মপ্রসাদ এল! এ ছাড়া ফ্রয়েডের কাম-সর্বস্ব তত্ত্বের একটা আলাদা মাদকতাও ছিল। বুদ্ধিজীবীরা এতদিনে যেন হদিশ পেলেন—সমাজ-বিন্যাসের। ফ্রয়েডের মতে "Man constructs his world out of appearances and science is the description and organisation of these appearances"! এই সাবজেকটিভ ধ্যানধারণার প্রসারে বিচ্ছিন্নতা ও নির্জনতাবোধ প্রশ্রয় পেল। নিউরোসিস ব্যতিক্রম নয়, নিয়ম;—এই ধারণা জন্মাল মানুষের মনে। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর ইউরোপে ফ্রয়েডীয় প্রভাবে ভাঁটা পড়লেও—আমেরিকায় এখনও চলেছে পূর্ণ জোয়ার।

কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায় ফ্রয়েডের তত্ত্বে নেই। তাঁর মতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ফলে সহজাত প্রবৃত্তির অবদমন ঘটবেই আর তার ফলে আসবে নিউরোসিস। নিউরোসিস হচ্ছে সভ্যতার সন্তান। যে মানবিকতার পুনর্জন্মের জন্য হাহাকার তুলেছিলেন সমাজপ্রেমিকের দল, ফ্রয়েড-তত্ত্ব সেই মানবতাবোধকে দিল প্রচণ্ড আঘাত। তিনি বললেন "Society was now based on complicity in the common crime [of patricide] ; religion was based on the sense of guilt and morality was based partly on the exigencies of this society and partly on the penance demanded by the sense of guilt।" নীতিবোধকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার আশা ফ্রয়েডবাদে নেই—অত্যন্ত নির্লজ্জ প্রতিক্রিয়াশীল ছাড়া আর সকলেই সেটা বুঝলেন। তাছাড়া ১৯৩২ সালে আইনস্টাইনের কাছে তিনি লিখলেন—যুদ্ধ এড়ানো যায় না—"It seems quite a natural thing, no doubt it has a good biological basis, and in practice it is scarcely avoidable"। এর পর ফ্রয়েডবাদের কাছে মানুষের প্রত্যাশা আর কিছুই রইল না।

তবু কিন্তু অনেকে আজও ইয়ুং, এডলার, ফ্রোমকে নিয়ে মাতামাতি করেন। ফ্রয়েডের সঙ্গে অতি সামান্য পার্থক্য এঁদের। বাংলাদেশের সমাজ-বিজ্ঞানীদের লেখায় প্রায়ই এঁদের উদ্ধৃতি দেখা যায়। তাই এঁদের কথা তুলতে হচ্ছে।

ইয়ুং সম্বন্ধে একজন আমেরিকার লেখক বলেছেন, "Freud actually walked this path for a long distance himself. He went the lengths of postulating unconsious fears of incests and castration that we supposedly inherit from our barbarous ancestors, Jung carried this theory of a radical unconscious even further to the point of imagining superior and inferior peoples, He carried his theories to their logical conclusion and accepted an official position from the nazis [Furst, J, 1954 : pp 65]। অলমতি বিস্তারেণ। আর এডলার আমদানি করেছেন ক্ষমতাসর্বস্বতা, ফ্রয়েডের

কামসর্বস্বতার বদলে। নীৎসে এ-বিষয়ে তাঁর পূর্বসূরী। ব্যক্তি মাত্রেই ক্ষমতালোলুপ। সমাজে অমানবিক যত কিছু ক্রিয়াকলাপ এই ক্ষমতালোলুপতাই তার মূলে। তিনি বলেন, বিচ্ছিন্নতা-বোধের মূলে রয়েছে ক্ষমতা না পাওয়ার দরুন বিষণ্ণতা ও হীনমন্যতা। এ্যাডলারের এই বাণী সমাজের আসল সমস্যা থেকে মানুষের নজর সরিয়ে আনার একটা অপকৌশল মাত্র। যে সমাজের প্রতি তিনজনে একজন উপবাসী, যে সমাজে শতকরা তিরিশজনের মাথার ওপর আবরণ নেই, সেখানকার সকলে ক্ষমতার লড়াইয়ে মেতে আছে বলা—মানুষকে অপমান করা। সমাজের ওপরতলার লোভের লড়াইকে সকলের লড়াই বলে চালাবার চেষ্টা আর পশু-জগতের 'স্ট্রাগল্ ফর এক্‌জিস্‌টেন্স' তত্ত্বকে মানুষের সমাজে প্রয়োগ করার ধৃষ্টতা, একই ধরনের অজ্ঞানতা অথবা ভণ্ডামী।

এরিক ফ্রোঁম গেল শতকের পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামো ও বিন্যাস নিয়ে আলোচনা করে দেখাতে চেয়েছেন, ধনতন্ত্র সামন্ততন্ত্রের চেয়ে উন্নততর সভ্যতা। পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হবার পর থেকে তার ভিতর যে সব গলদ দেখা দিয়েছে—ধীরে ধীরে যে সব গলদ আজ দূষিত ঘায়ের মত দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে—সে সব গলদের দিকে ফ্রোমের নজর পড়েনি! তিনি বরঞ্চ "Escape from Freedom"-এ এই তত্ত্ব খাড়া করেছেন যে ধনতন্ত্র মানুষকে দিয়েছিল মুক্তি, দিয়েছিল স্বাধীনতা; কিন্তু সে মুক্তি মানুষের সইল না, তাই, সে স্বেচ্ছায় ফ্যাসিবাদের একনায়কত্ব বরণ করে নিয়েছে! ফ্যাসিজমের উদ্ভবের এই উৎকট তত্ত্ব অধিকাংশ মানুষ মেনে নেবেন না—আমি বিশ্বাস করি। এখানেও দেখতে পাই সেই পুরানো ফ্রয়েডীয় ধারণার প্রভাব। সেই সনাতন সহজাত প্রবৃত্তির জয় জয়কার, অবশ্য একটু প্রচ্ছন্ন ভাবে।

ফ্রয়েডপন্থী সমাজতাত্ত্বিকরা অনেক সময় বর্তমান সমাজবিন্যাস ও সংস্কৃতির কথা তুলেছেন একথা সত্যি। তবে তাঁরা সাধারণভাবে শিশু-মাতা সম্পর্কের বিকৃতি ও শৈশবকালীন বঞ্চনা-হতাশাকেই নিউরোসিস তথা বিচ্ছিন্নতার একমাত্র বা প্রধান কারণ বলে উপস্থাপিত করেছেন। মীড বলেছেন মানুষেব চরিত্র গঠনের মূলে আছে—"nursing, weaning, toilet training and infant feeding"। শৈশবে এর যে কোন একটির বিশৃঙ্খলা ঘটলে মানুষ অসামাজিক ও মনোবিকারগ্রস্ত হতে বাধ্য।

মনে হয় মীড বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শ্রেণীসংঘাত, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে এড়িয়ে যাবার জন্য শিশুর জৈব প্রয়োজনবোধকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন।

এডলারের কথা আগেই বলেছি—শ্রেণীবিশেষের ক্ষমতা-লোলুপতাকে তিনি সর্ব-মানবিক সহজাত প্রবৃত্তি বলে মনে করেছেন। আমাদের সামাজিক প্রবৃত্তির চেয়ে একে অনেক বেশী শক্তিশালী মনে করে হতাশা প্রকাশ করেছেন।

এডলার বলেছেন, "The social feeling exists within us and endeavours to carry out its purpose, it does not seem strong enongh to hold its own against all opposing forces."

বর্তমান যন্ত্রযুগ এঁদের মতে বিচ্ছিন্নতার কারণ। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী উন্নতি সমাজের মঙ্গলের নয়, অমঙ্গলের সূচক—এই এঁদের মত।

আজকের দিনের এই বিচ্ছিন্নতার কারণ নির্ণয়ে বা প্রতিকার পরিকল্পনায় ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক সমাজতাত্ত্বিকদের কাছ থেকে কোন সাহায্যই আসছে না। বরং মনে হয়, ফ্রয়েডীয় ধ্যানধারণা মানুষের বিচ্ছিন্নতাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করছে।

বিচ্ছিন্নতার মূল কারণের হদিশ কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানই দিতে পারে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান পাভলভের

মস্তিষ্কবিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞান প্রাকৃতবিজ্ঞানের সমগোত্র—বিষয়গত (objective) পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে পুষ্ট।

সমাজকে বুঝতে গিয়ে পাভলভের পূর্বসূরীরা দ্বান্দ্বিক বিচারপদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। প্রাকৃতিক বিবর্তন আর সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে একটা মস্ত বড় গুণগত পার্থক্য এঁদের চোখে পড়েছে। প্রকৃতি আপনা থেকে বিবর্তিত হচ্ছে—আর সমাজ পরিবর্তনে মানুষ সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে। মানুষ এখানে নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র নয়। Everything that sets men acting must find its way through their brain (এঙ্গেলস)। মানুষ কাজ করে সজ্ঞানে, পূর্বপরিকল্পনানুযায়ী ; নির্জ্ঞান মনের অন্ধ জৈব-প্রবৃত্তির তাড়নায় নয়। বাবুই পাখির বাসা বাঁধা, মৌমাছির চাক গড়া—এগুলো পাভলভের ভাষায়, আনকনডিসন্ড রিফ্লেক্স বা ইনস্‌টিংটিভ অ্যাকটিভিটি।

"What distinguishes the worst of architect from the best of bees in this that the architect raises his structure in imagination before he erects it in reality" (মার্কস)। সে তার শ্রম দিয়ে নিরন্তর সজ্ঞানে প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করার চেষ্টা করছে,—শুধু পরিবর্তন ঘটাচ্ছে বললে ঠিক হবে না। "He not only effects a change of form in the material on which he works, but he also realises a purpose of his own that gives the law to his modus operandi" (মার্কস)। মানুষ কাজ করে তার জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়ে, মানুষ কাজ করে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে। ব্যক্তিগত ভাবে মানুষ চিরদিন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্য নিয়েই কাজ করে আসছে। সমাজতান্ত্রিক দেশের পাঁচ বা সাত সালা পরিকল্পনা সেই উপলব্ধির সম্প্রসারণ। মানুষের আচার ব্যবহারের সব সময় একটা উদ্দেশ্য ও অর্থ আছে। আর সেই উদ্দেশ্য ও অর্থ বোঝবার জন্য অবচেতন মনে অবগাহন করার প্রয়োজন নেই। উদ্দেশ্য ও অর্থ সময় সময় অনুমান সাপেক্ষ হলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানবুদ্ধির বোধগম্য। সামাজিক স্থিতি ও পরিবর্তন মানুষের উদ্দেশ্য প্রণোদিত কার্যকলাপ লব্ধ ফল। এদিক দিয়ে বিচার করলে বলা চলে, সামাজিক পরিবর্তন অনেকাংশে বিষয়ীগত (subjective)। মোট কথা সমাজে যা ঘটছে—তার জন্য ব্যক্তিই দায়ী। "Man must be made to understand that he is both creator and master of the world, that on him rests the responsibility of all that is evil on the world, and that to him belongs also the glory for all that is good in life" (গোর্কি)। তবে এটাও মনে রাখা দরকার খেয়ালখুশি মত এই উদ্দেশ্য আরোপ করা চলে না।

সব অবস্থায় সব কিছু করা সম্ভব নয়। পরিকল্পনা বহির্বাস্তবের ওপর নির্ভর না করে যদি পরিকল্পনার ওপর নির্ভরশীল হয়, আমরা তাকে বলি—ইউটোপিয়ান। অতীতের শ্রমলব্ধ ফল বর্তমানকে সমৃদ্ধ করে। মানুষ সেই বর্তমানকে পূর্বলব্ধ জ্ঞানবুদ্ধির খাতে প্রবাহিত করে নিয়ে চলে ভবিষ্যতের ফল সমুদ্রের দিকে, লাভ করে নতুন জ্ঞান। নতুনতর, মহত্তর উদ্দেশ্য আরোপিত হয় তার পরিকল্পনায়, তার ক্রিয়াকলাপে। সামগ্রিক আচরণের রূপান্তর ঘটে, নতুন মানবিক সম্পর্ক স্ফুরিত হয়। পুরানো দিনের নীতিবোধ, মূল্যবোধ, অভ্যাসকর্ম, যদি চলার পথের বাধা হয়ে দাঁড়ায় ; তাকে ভেঙ্গে চুরেই মানুষ এগিয়ে চলে। গড়ে ওঠে নতুন অভ্যাস কর্ম, নীতিবোধ ও মূল্যবোধ। এইভাবেই সমাজে রূপান্তর ঘটছে কখনও দ্রুত জেট প্লেনের গতিতে ; আবার কখনও ঠিক উল্‌টো, দুল্‌কি চালে, পাল্‌কি চলার ছন্দে,—মৃদু গতিতে। মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিকে যদি বিভ্রান্ত করা না হয় অথবা সজ্ঞান পরিকল্পিত পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনের পথে, যদি স্বার্থান্বেষীর উদ্দেশ্য প্রণোদিত বাধা না আসে, তবে সামাজিক রূপান্তর ও ব্যক্তিমানসের তদনুযায়ী পরিবর্তন, [যথা নতুন কার্যক্রম ও ধ্যানধারণার উপলব্ধি] অনেকটা সহজভাবেই ঘটতে পারে ও ঘটেও থাকে।

যেমন ঘটছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে। অবশ্য এ কথা বলছি না, সেখানে সব সময়েই পুরানোর গর্ভে নতুনের জন্মে—প্রসব বেদনা অনুভূত হচ্ছে না, বা কোন প্রসবকালীন সঙ্কট দেখা দিচ্ছে না। কিছু কিছু সমস্যা নিশ্চয়ই থাকছে, আবার নতুন সমস্যাও দেখা দিচ্ছে, কিন্তু আমাদের অতি পরিচিত সমাজব্যবস্থার, এই পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার তুলনায়, সমস্যা কম—সঙ্কট অনিবার্য নয় এবং বিচ্ছিন্নতার বিলাপ ব্যাপক নয়। বড়জোড় ব্যতিক্রম।

আমেরিকার একজন মানসিক রোগবিশেষজ্ঞের মতে মনের সবরকম দ্বন্দ্ব ও ব্যবহার-বৈপরীত্যের মূলে আছে বর্তমান সমাজের দ্বন্দ্বমূলক উৎপাদন ব্যবস্থা। "Production is social, but is owned and controlleed by individuals who use it for their own private purposes and profit."

বিচ্ছিন্নতা উৎপাদন-বন্টন ব্যবস্থার বৈষম্য ও বৈপরীত্যের ফল। গত কয়েক বছরের বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করেছে। আণবিক বিস্ফোরণকে আয়ত্তে আনতে পারার ফলে অমিত-শক্তির অধিকারী আজ মানুষ। ইলেকট্রনিকের দ্রুত উন্নতির ফলে যান্ত্রিক স্বয়ংক্রিয়তা আজ সহজ, সুলভ। সামনে নতুন দিগন্ত উদ্ভাসিত--যার আভাসে আজ মানুষ মাত্রই চঞ্চল। বিজ্ঞানের এই নববিপ্লবলব্ধ তথ্য-কৌশল প্রয়োগে সব রাষ্ট্রই তৎপর। কারিগরী ও বিজ্ঞানশিক্ষার নতুন পাঠক্রম তৈরি হচ্ছে দেশে দেশে। রাষ্ট্রনায়করা বাধ্য হচ্ছেন শিক্ষার বিস্তারে সহায়তা করতে। ফলে মানুষের পুরানো শিক্ষা যে-মানসিকতা ও হৃদয়বৃত্তি গড়ে তুলছিল, সেগুলো নতুন শিক্ষার সংঘাতে ভেঙ্গে পড়ছে। মানুষের বিপুল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট নির্দেশ আজ কোন কৌশলেই গোপন রাখা যাচ্ছে না। বিজ্ঞানের নাট্যশালায় পটপরিবর্তন ঘটছে অতি দ্রুত—এত দ্রুত যে তার সঙ্গে তাল রেখে দর্শকদের মেজাজ পরিবর্তিত হচ্ছে না, কারণ মেজাজ পরিবর্তনের জন্য সক্রিয় কোন চেষ্টাই নেই। নতুন সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ আজ হতভম্ব। অতীত বর্তমানের চিন্তাভার-পিষ্ট. দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের রূঢ় বাস্তবতাজাত মানসিকতা ও হৃদয়বৃত্তি ভেঙ্গে পড়ছে; কিন্তু কল্যাণময় ভবিষ্যৎ সৃষ্টির উপযোগী মানসিকতা ও হৃদয়বৃত্তি গড়ে উঠছে না। বাধা দিচ্ছে অতীতের প্রেত—মালিকানার স্বার্থ আর সেই স্বার্থপুষ্ট কৌশলী অপপ্রচার।

পরিবর্তনের দ্রুততা বা যন্ত্রদানবের স্বাধিকার প্রমত্ততা এ বিচ্ছিন্নতায় কারণ নয়; যতই বলুন না কেন রক্ষণশীল সমাজতান্ত্রিক মনস্তাত্ত্বিকদল। কারণ নিহিত রয়েছে অন্যত্র এই প্রসঙ্গে রবার্ট কারাওয়ে বলেছেন, "The primary source of 'alienation' is the development of social production accompanied by a growing division of labour........ Private ownership and the break-up of society into hostile classes lead to a situation in which the social division of labour 'alienates' from the workers some of the vital functions inherent in man's intellectual activity, the freedom to dispose of the product of his own labour, to have a say in the management of production etc........." (World Marxist Review, October 1960) কায়িকশ্রম থেকে বিচ্যুত হয়েছেন বুদ্ধিজীবীরা আবার শ্রমিকদের নেই বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগ করবার সুযোগ সুবিধা। কারাওয়ে এই প্রবন্ধে যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে মানুষ [বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী সকলেই] পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় তার শ্রমলব্ধ ফলের ওপর অধিকার হারিয়ে ক্রমশঃ অসহায় হয়ে পড়ছে। সে শ্রম করে যান্ত্রিকভাবে।—যন্ত্রেরই একটা ছোট দাঁতে আটকে গিয়ে যন্ত্রের গতির সঙ্গে ঘুরপাক খাচ্ছে। অর্থ ও উদ্দেশ্য আরোপিত হচ্ছে না তার কাজে, কাজেই তার আচারব্যবহারেও দেখা দিয়েছে অর্থহীন বিশৃঙ্খলা। বিচ্ছিন্নতার কারণ যন্ত্র নয়,—যন্ত্রকে উদ্দেশ্য পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করার স্বাধীনতার

অভাব। তিনি ঐ প্রবন্ধেই লিখেছেন, "Capitalism signifies the dominion of things over man: under capitalism the social and personal relations between people are dominated by these things not only in their minds, but also in reality, all the way to everyday life………In a milieu where everything is bought and sold, the bourgeuis marries not the woman but her dowry; friends are made for what can be got out of them; the thought of the legacy ousts love of parents; man is not respected for his pesonal qualities, but for his wealth or for the position he occupies… …" এই সমাজব্যবস্থায় মানুষের জন্য শ্রম নয়; শ্রমের জন্য মানুষ—মুনাফা বাড়াবার জন্য মানুষ। সৃষ্টির তাগিদে মানুষ এখানে কাজ করে না, কাজ করে তার জৈব প্রয়োজন মেটাতে। ঘানিগাছে জুড়ে দিয়ে তাকে অবিরত পাক দেওয়া হচ্ছে। যন্ত্রদানব পাক দিচ্ছে না—পাক দিচ্ছে যন্ত্রদানবের মালিকের দল। তাই মার্কস বলেছিলেন—"estranged labour makes man's species life a means to his physical existance"। শুধু শ্রমজীবী নয়, বুদ্ধিজীবীকেও বাজারের চাহিদা অনুযায়ী, বাজার দরে বুদ্ধি-শ্রমকে বেচতে হয়। চাহিদা তৈরির কর্তা—সেই মুনাফা সন্ধানী মালিকগোষ্ঠী। সাহিত্য-শিল্পও তাই এই সমাজেরই উৎপাদন নীতি মেনে চলতে বাধ্য। বিচ্ছিন্নতার বিলাপ নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি যত হয়—এ রোগের সমাধানের ইঙ্গিত নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি হয় তার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। কেননা সেটা মালিকগোষ্ঠীর অভিপ্রেত নয়, তাই তার চাহিদাও নেই। উদ্দেশ্যহীন নোঙরছেঁড়া ভাবে শুধু জৈব প্রয়োজন মেটাতে কাজ করে চলেছে মানুষ।

এই পারপাস বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পাভলভ কি বলেছেন দেখা যাক ঃ "Human life consists in the attainment of every possible sort of purpose to which is applied every degree of human energy…An analysis of the activity of animals and of human beings leads me to the conclusion that among the reflexes there must exist a special one—the reflex of purpose—an aspiration to the attainment of a difinite exciting object, using attainment and object in the broad sense of the term." [আই. পি. পাভলভ লেকচার্স অন কনভিশন্‌ড রিফ্লেক্সেস।] পাভলভ এই রিফ্লেক্স অফ পারপাসকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, তার প্রমাণ মেলে এই উদ্ধৃতি থেকে ঃ "The reflex of purpose is of great and vital importance; it is the fundamental form of life energy to us all… All life, all its improvement and progress, all its culture are affected through the reflex of purpose… ।" উদ্দেশ্য পরিপূরণের পথে বারবার বাধা পড়লে এই রিফ্লেক্স অফ পারপাস ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে একেবারে নিভে যেতে পারে। উপবাস করতে বাধ্য হলে, আমরা জানি, কয়েকদিন পরেই খিদে চলে যায়। ফুড রিফ্লেক্স আর সক্রিয় থাকে না। জীবনের স্বাভাবিক ক্ষুধা-তৃপ্তি যদি বারবার বাধা পায়, প্রধান পরাবর্ত (reflex) যদি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসে, তাহলে জীবনের প্রতি আকর্ষণ নিঃশেষ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। আর তাই ঘটেও থাকে। বিচ্ছিন্নতা সম্পূর্ণ হয়। মাত্র কয়েক বছর আগেও—পাভলভ বলেছেন—চীনদেশে নাকি টাকা দিয়ে ফাঁসী কাঠে ঝোলবার জন্য, মূল আসামীর পরিবর্তে ভাড়া করা আসামী পাওয়া যেত।

বুদ্ধিজীবীর চিন্তাধারাতেও বিকৃতি ঘটছে, উদ্দেশ্য প্রণোদিত কাজের অভাবে ও উৎপন্ন দ্রব্যের উপর কর্তৃত্ব হারিয়ে তার চিন্তাধারাও হয়ে উঠেছে অর্থহীন। তাই সত্যকে মনে করছে মায়া, মায়াকে মনে করছে সত্য। paranoia-র প্রসার ঘটছে।

পৃথিবীটা আজ বিচ্ছিন্ন। ভেঙ্গে যেন দুটো আলাদা টুকরো হয়ে নতুন কেন্দ্রে ঘুরপাক খাচ্ছে। চিন্তাবিদদের

দুই ভিন্নমুখী চিন্তায় সাধারণ মানুষ উদ্‌ভ্রান্ত ও উৎকেন্দ্রিক। একদল পুরানো সমাজব্যবস্থা ও তদানুষঙ্গিক ধ্যানধারণা, নীতিবোধ, মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ বজায় রেখে নতুন সম্ভাবনাকে ধীরেসুস্থে পুরানোর সঙ্গে জোড়াতালি দিয়ে মানিয়ে নেবার পক্ষপাতী—আর একদল অতীতের শবকে অগ্রগতির পথ থেকে সরিয়ে ফেলে, নতুন শক্তি ও পদ্ধতিকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে সমাজব্যবস্থার আমূল ও দ্রুত পরিবর্তন-প্রয়াসী।

এই সমস্যা ও দ্বন্দ্ব চিরকালের নিঃসন্দেহ, কিন্তু আজকের তীব্রতা ও ভীষণতা অননুভূতপূর্ব। কারণ আগেই বলেছি। মানুষের বিপুল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের বাস্তব রূপায়ণ যতই সুনিশ্চিত হচ্ছে, পুরানো স্বার্থের হতাশাজনিত আর্তচীৎকার ও বাধাদান ততই বাড়ছে। পারমাণবিক মারণাস্ত্রের ভারে বসুন্ধরা কম্পমান। সম্মুখে জীবজগতের সর্বাত্মক ধ্বংসের ছবি।

ভয় পাচ্ছে অনেকেই। ভয় থেকে জড়তা, অদৃষ্টবাদীর নিষ্ক্রিয়তা,—ফলে মানবিক সম্পর্কের অবনতি আর বিচ্ছিন্নতা। বিচ্ছিন্নতা আজ ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী। সমাজ থেকে গোষ্ঠীতে, গোষ্ঠী থেকে পরিবারে, পরিবার থেকে ব্যক্তিমানসে অনুপ্রবিষ্ট। এর প্রকোপ সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াতেও যে একেবারে অনুভূত হচ্ছে না এমন নয়। সোভিয়েত সাহিত্যেও এক আধটা আধা আউটসাইডারের দেখা মিলছে। অবশ্য দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। তা' হলেও অন্য দেশের কাগজ পত্রে শোরগোল উঠেছে। মাঝে মাঝে Tedy boys-দেরও দেখা মিলছে সমাজতান্ত্রিক দেশের রাজপথে। ধনতান্ত্রিক দেশের তুলনায় সংখ্যা অতি নগণ্য হলেও, এদের উপস্থিতি বিচ্ছিন্নতার ব্যাপকতার দর্শন।

বিচ্ছিন্নতা আর তার ফল স্বরূপ নিউরোটিক, সুইসাইডের ক্রমবৃদ্ধির মূল কারণগুলোর হদিশ দিতে পারা গেছে মনে হয়। এইবার দেখা যাক প্রতিকারের উপায় আছে কি না? এবং থাকলে সেটা কতদূর। পাভলভ বলেছেন রিফ্লেক্স অফ পারপাস একেবারে মরে না। হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে পারে। জীবন যখন শুকিয়ে যায় তখন করুণাধারাকে আবাহন করা চলে। তাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে রস সিঞ্চিত করে, সতেজ করে তোলা চলতে পারে। ফুড রিফ্লেক্সের সঙ্গে তুলনা টেনে বলেছেন, with regular dietetic regime, a proper amount of food and a periodicity in taking it—মরে যাওয়া ক্ষুধাকে জীইয়ে তোলা যায়। নিউরোটিক রোগীর চিকিৎসায় পাভলভিয়ানরা এই রকম ব্যবস্থাই করে থাকেন। ফলও পাওয়া যায় দেখা গেছে। কাজেই হতাশ রোদনের প্রয়োজন নেই। এ অবস্থা শাশ্বত সনাতন নয়। বিচ্ছিন্নতা ব্যাধিরও চিকিৎসা আছে। ব্যক্তিগত চিকিৎসার কথা থাক। সমষ্টিগত ভাবে এই পুঁজিবাদী সমাজেই এই ব্যাধির প্রতিরোধের কি ব্যবস্থা হচ্ছে দেখা যাক।

বিচ্ছিন্নতা আজ শুধু শ্রমজীবী শ্রেণীতে নিবদ্ধ নয়। একচ্ছত্র পুঁজির দাপটে ও প্রয়োজনে ক্ষুদ্রশিল্পে, ব্যবসায়েও সঙ্কট দেখা দিয়েছে। পুঁজিবাদের নিজস্ব নিয়মে ছোটখাটো মালিকরা ক্রমশঃ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। একচ্ছত্র পুঁজিতে আবার পরিচালকের ক্ষমতাও ক্রমশঃ গৌণ হয়ে পড়ছে। অনেক যৌথ কোম্পানী যুক্ত হয়ে করপোরেশন, কারটেল, তৈরি হয়েছে। হোল্ডিং কোম্পানীর রেওয়াজ বেড়ে চলেছে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের দৌলতে পরিচালনাও ক্রমশঃ যান্ত্রিক হয়ে উঠছে। অনেক পরিচালক তাই কারবারের শুধু অংশীদার হয়ে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। মুনাফার পাহাড় জমছে বটে, কিন্তু সৃজনমূলক ও উদ্দেশ্যমূলক কাজের অভাবে, এঁদেরও মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি চালনার সুযোগ সীমিত। কাজেই এঁরা বাইরের জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে মনোজগতে সুড়ঙ্গ খুঁড়ছেন অথবা উদ্দেশ্যবিহীন বন্য জীবনের নেশায় মেতে নিজেদের ধ্বংস করছেন।

'অটোমেশন' গেল দশ বছরে শিল্পে-সমাজে খানিকটা প্রভাব বিস্তার করেছে। আগামী কয়েক বছরে, এ-প্রভাব শিল্প-অগ্রসর দেশে হয়ে উঠবে বিস্তৃত। গ্রাম ও নগরীর ব্যবধান ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে যাবে। কায়িক শ্রম

ও বৌদ্ধিক শ্রমের সীমারেখাও সঙ্কুচিত হয়ে আসার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। যান্ত্রিক স্বয়ংক্রিয়তা বেকারের সংখ্যাও বাড়াচ্ছে নিঃসন্দেহ।

একচ্ছত্র পুঁজিবাদের যুগে বিচ্ছিন্নতা হয়ে উঠছে ব্যাপক ও গভীর। শুধু শ্রমিকশ্রেণীকে নিঃস্ব করেই আজ একচ্ছত্র পুঁজির ক্ষুধা মিটছে না, প্রায় সর্বস্তরের অধিকাংশ মানুষের স্বার্থে সে আঘাত দিতে বাধ্য হচ্ছে! নিঃস্বতা, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা ও তদ্দরুন বিচ্ছিন্নতা জনসাধারণের প্রায় প্রতিটি স্তরেই আজ চোখে পড়ছে।

এই বিচ্ছিন্নতা বর্তমান সমাজব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বৈপরীত্যের ফল। পুরানো মূল্যবোধের জিগির তুলে একে দূর করা যাবে না। নিজের নিয়মে সামাজিক ভাঙন দ্রুত এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। এর অর্থ, বিচ্ছিন্নতা-গ্রস্ত এই সমাজব্যবস্থার নেতিকরণের (negation) সর্বাত্মক প্রস্তুতি তার নিজের মধ্যেই তৈরি হচ্ছে। ভাঙনের পাশে পাশেই নতুন নীতিবোধ, নতুন মূল্যবোধের বনিয়াদ গড়ার কাজ চলেছে! নতুন ভাবাদর্শের, নতুন প্রতিষ্ঠানের ইমারত দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু তার ভিত্তিপ্রস্তরের আভাষ সুস্পষ্ট। তার অস্তিত্ব বিচারসাপেক্ষ, কিন্তু দুর্বোধ্য নয়। আগেকার দিনের সহযোগিতা ও মানবিক সম্পর্ক আজ চোখে পড়ছে না বটে, কিন্তু নতুন ধরনের সহযোগিতাভিত্তিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুনতর মানবিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে চলেছে নিঃসন্দেহে।

প্রথম, জাতিসংঘ গঠন নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক সহযোগিতার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। সংঘের সনদ দুনিয়ার মানুষের শান্তি-সহযোগিতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব-কামনার নিদর্শন। অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও জাতিসংঘ বিশ্বের রাজনীতিতে এক নতুন পরিমণ্ডল স্রষ্টা। অনস্বীকার্য যে, ইউনেস্কো ও জাতিসংঘের অন্যান্য সম্পূরক প্রতিষ্ঠান অন্ততঃ আংশিকভাবে বিশ্ব-কল্যাণে নিয়োজিত। বলতে পারি, মানবেতিহাসের এ এক উল্লেখ্য পদক্ষেপ।

দ্বিতীয়, সব দেশেই আজ শুনছি শান্তিকামী মানুষের বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য সোচ্চার অঙ্গীকার। এ এক নতুন নীতিবোধ ও মূল্যবোধের সূচনা। সর্বধ্বংসী পারমাণবিক যুদ্ধের ভীতি মানুষের সঙ্গে মানুষের একাত্মবোধকে এক নতুন স্তরে উন্নীত করেছে, যার কল্পনাও আমরা কয়েক বছর আগে করতে পারতাম না। এর মধ্যে ধনিকশ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণী. বুদ্ধিজীবী, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, সাহিত্যিক সকলেই রয়েছেন। এ আন্দোলনে আছেন ব্রিটেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সোভিয়েত রাশিয়া, ভারতবর্ষ, চীন, আফ্রিকার বহু মনীষী ও চিন্তাবিদ্—যাঁদের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক স্বার্থসম্পর্ক বা শ্রেণীগত ঐক্য নেই। এঁদের আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে মানবিক সম্পর্কের নতুন মূল্যায়নের চেষ্টা চলেছে। মানুষ এই আন্দোলনের মধ্যে সন্ধান পেয়েছে অস্তিবাচক উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানীদের একটি বিশ্বসংস্থাও পারমাণবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে কাজ চালাচ্ছেন। এইসব সংস্থার বক্তব্য ও প্রস্তাব গ্রহণে আমরা বিশ্বমৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বারবার উল্লেখ দেখতে পাই। অবশ্য ঐ কথাগুলো অভিধানে ছিল, ব্যবহৃতও হত। কিন্তু আমরা এদের বিমূর্ত কল্পনার সঙ্গেই পরিচিত ছিলাম। সন্দেহাতীতভাবে এ'কথাগুলো আজ মূর্ত ও বিশেষ অর্থব্যঞ্জক হয়ে উঠেছে।

তৃতীয়, এই ধরনের আন্দোলন ছাড়াও, কিছু কিছু গঠনমূলক আন্তর্জাতিক সংস্থার খবর আমরা জানি, যার মূল প্রেরণা আসছে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সহকর্মিতার সদিচ্ছা থেকে। উদাহরণ স্বরূপ আমি ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান বৎসরের ক্রিয়াকলাপের ও দক্ষিণমেরু উন্নয়ন সংস্থার নাম করব। গাগারিনের মহাশূন্য পরিক্রমায় ইউরোপের অনেক মানুষ এমন আন্তরিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন—যা থেকে মনে হবে এ' সাফল্য ব্যক্তি বা দেশবিশেষের নয়, একে মানুষ জাতির সাফল্য বলেই তাঁরা মনে করেছেন। ইউরোপের টেলিভিশনের পর্দায় গাগারিন-এর সংবর্ধনা উপলক্ষে মস্কোর অনুষ্ঠান সরাসরি এই প্রথম প্রদর্শিত ও প্রচারিত হয়েছে। এ ঘটনার বিশেষ গুরুত্ব আছে।

চতুর্থ, আজ জেটের যুগে পৃথিবীর পরিধি সংকীর্ণ হয়েছে। সংবাদ আদান-প্রদানই পরস্পরকে জানবার একমাত্র উপায় নয় আজ। টুরিস্টদের দল আজ হাজারে হাজারে নিজের দেশের খবর অন্য দেশের মানুষের কাছে

পৌঁছে দিচ্ছেন ; অন্য দেশের মানুষদের দেখছেন, জানছেন। এই দেখা ও জানার কিছুটা হয়তো গোয়েন্দাচক্রের জঘন্য উদ্দেশ্যে, কিন্তু বেশীর ভাগই আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রবোধকে বাড়াচ্ছে ও বিচ্ছিন্নতারোধে সহায়ক হচ্ছে নিঃসন্দেহে। গত এক দশকে পৃথিবীর মানুষ পরস্পরকে জানবার ও বোঝবার অজস্র সুযোগ পেয়েছেন। তাই বলছি, বিশ্বমানবতা আজ আর অভিধানিক শব্দমাত্র নয়—স্পষ্ট ও মূর্ত হয়ে উঠেছে। কিউবা ও কঙ্গো, অ্যাঙ্গোলা ও লাওসের রাজনৈতিক আবহাওয়া শুধু নয়, যে কোন দেশের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও আজ দুনিয়ার প্রতি মানুষের মানসিক আবহাওয়াকে প্রভাবিত করছে। লুমুম্বার নামে আজ দেখছি মস্কোতে বিশ্ববিদ্যালয়, টেগোরের নামে ন্যু-ইয়র্কে পার্ক। লুমুম্বার হত্যাকাণ্ডে শুধু কঙ্গোলীদের মন নয়, বাংলা দেশের কবিহৃদয়ও আজ পীড়িত, বিচলিত।

পঞ্চম, অনুন্নত দেশকে সাহায্য দান নীতির মধ্যে হয়তো দাতা রাষ্ট্র বা তার মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থ থাকতে পারে, কিন্তু এই লেনদেন, দাতা গ্রহীতা দুই দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে নিশ্চয়ই সম্প্রীতি ও বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে তুলছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র ছেড়ে এবার জাতীয় ক্ষেত্রে আসা যাক। অগ্রগামী দেশগুলিতে জনসাধারণের এক বিরাট অংশের মধ্যে একচ্ছত্র পুঁজির বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে—কোথাও মৃদু কোথাও তীব্র। আন্দোলনের কারণ রাষ্ট্রবিশেষে বিভিন্ন। অস্ট্রেলিয়া বা কানাডার আন্দোলনের কারণ আর বেলজিয়ামের কারণ এক নয়। বিভিন্ন স্থানের আন্দোলনের গুণ ও গতি আলাদা। পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে লর্ড রাসেল পরিচালিত ইংলণ্ডের আধুনিক আন্দোলন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই আন্দোলনগুলো মূলতঃ যুদ্ধ ও একচ্ছত্র পুঁজিবাদবিরোধী কিন্তু আগের মত কেবল শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন নয়। বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই আন্দোননের পুরোধায়। এঁরা বাইরের চাপে বা শুধু অথনৈতিক কারণেই এ আন্দোলনে নেমেছেন ভাবলে ভুল হবে। এর মধ্যে আছে বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিজীবী—ছোট ও মাঝারি কারবারী ও আরও অনেকে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয়—জীবনবোধের তাগিদে তারা একত্র হয়েছে। সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতা মানবজাতির মুক্তি আন্দোলনে পরিণত হতে চলেছে। অনগ্রসর দেশগুলোতে ভারী শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণের পরিকল্পনা মাফিক পুঁজি বিনিয়োগের ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। হয়তো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই একচ্ছত্র পুঁজির ষড়যন্ত্রে বা প্রভাবে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হচ্ছে না, কিন্তু মোটামুটিভাবে এই ব্যবস্থাকে আমরা একচ্ছত্র বিরোধী ব্যবস্থা নিশ্চয়ই বলতে পারি। রাষ্ট্রনায়কদের অসাফল্যে হয়তো জনসাধারণের মনে আপাততঃ নৈরাশ্যবোধ ও বিচ্ছিন্নতাবোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিলীয়মান মরীচিকাস্বপ্ন জনসাধারণের মনে নতুন দিগন্তের স্বর্ণছবি তুলে ধরে তাকে নতুন আদর্শ ও মূল্য নিরূপণে, নতুন উদ্দেশ্য আরোপনে উৎসাহিত করছে না কি? পরিচয়স্বল্পতার জন্য আমরা তাকে স্বাগত জানাতে পারছি না।

নতুন সামাজিক, জাতীয়, ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার জন্যে যে মানসিকতা ও মূল্যমানের প্রয়োজন, মানব-চরিত্রে ধীরে ধীরে তারই উন্মেষ ঘটছে। জীবনের নতুন উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন আবিস্কৃত হচ্ছে ও সেই উদ্দেশ্য সম্পূরক পরাবর্ত সংঘটিত হচ্ছে। এখন If everyone of us will cherish within himself this reflex, as the most precious part of his being and if parents and instructors of all ranks will make their chief problem the strengthening and developing of this reflex in the plastic masses………then we shall become that which we should and can be" (Pavlov)

উপসংহারে বক্তব্য পরমাণুযুগে যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার অস্তিবাচক দিকের কয়েকটি ইঙ্গিতমাত্র এখানে দেবার চেষ্টা করেছি, তবে নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক দিকের শক্তি অবহেলনীয় নয়। বিচ্ছিন্নতার নেতিকরণ স্বতঃসিদ্ধ স্বয়ংক্রিয় ঘটনা নয়, মানুষের ভূমিকা এখানে মুখ্য। সদাজাগ্রত দৃষ্টি, সক্রিয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে অস্তিবাচক ধারাস্রোতকে প্রশস্ত ও বেগবান করে তোলার দায়িত্ব আমাদের। তবে সুস্থ মানবিকতাবোধ ও বিশ্বসৌভ্রাত্রবিকাশের পরিবেশ প্রস্তুত ; আর মানবমস্তিষ্কে নতুন গুণসঞ্চারও সম্ভব। সুতরাং বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশার বিলাপ ক্লীবধর্ম, অনুচিত।

[স্মারক (৩য় সংখ্যা) পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জ্জিত রূপ]

প্রাচীন আর্য-সমাজে নারী ও পুরুষ

ডক্টর জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য

প্রাচীন আর্যদের পরিচয় আমরা অধুনা প্রাপ্ত কোন পুস্তক হইতেই জানিতে পারি না। বেদ প্রাচীনতম গ্রন্থ সত্য। কিন্তু পরবর্ত্তী গ্রন্থে প্রাচীন সমাজের সম্বন্ধে এমন কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যাহা বর্তমান বেদে পাওয়া যায় না। বেদের বহু শাখার বিলোপের কথা আমরা অতি প্রাচীন গ্রন্থে, অর্থাৎ পাতঞ্জলীর মহাভাষ্যে দেখিতে পাই। বেদের যে অংশটুকু মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার কতগুণ বেশী যে বেদের আকৃতি ছিল, তাহা শুধু অনুমান করা যায়। সেই সব গ্রন্থে কী ছিল তাহা জানিবার আমাদের কোন সহজ উপায় নাই। অনুমানের সাহায্যে আমাদের এই প্রবন্ধের গোড়াপত্তন করিতে হইবে। কতদূর সফল হইব তাহা জানি না। তবে কুতূহলী মনকে যদি একটু সক্রিয় করিয়া তুলে তাহা হইলেই এই শ্রম সার্থক হইয়াছে বুঝিব।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আমরা প্রথমে চারিটি যুগের বিশদ বিবরণ দেখিতে পাই। কিন্তু সে গ্রন্থ চারিটি যুগের সামাজিক জীবনের সুস্পষ্ট ছবি পূর্ণভাবে অঙ্কিত হয় নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে সামাজিক জীবনের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহারও বিশদ বিবরণ আমরা কোন প্রাচীন পুস্তকে পাই না। আকারে ইঙ্গিতে ঋগ্বেদে হয়ত বিবাহপ্রথা সম্বন্ধে অস্পষ্ট আভাষ আছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সুসংবদ্ধ অনেক সামাজিক বিষয়ের—অনুসন্ধিৎসু মন কোন সংবাদই পায় না। মহাভারতে রামায়ণে বা মনুসংহিতায় যে সব কথা অতি সংক্ষিপ্তভাবে বলা হইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া শুধু কল্পনার প্রদীপ হাতে ধরিয়া প্রাচীনতত্ত্ব অন্বেষণ করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। এই অসহায় অবস্থায় পদে পদে বুদ্ধিবৃত্তির প্রমাদ যে ঘটিতে পারে, তাহা অস্বীকার করা অসম্ভব।

এখন কাজের কথায় আসা যাক। মানুষ তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া যৌথভাবেই বাস করিত। একটি দল অপর দলকে জানিত বলিয়া মনে হয় না। দলের লোকেরা চাষবাস করিতে জানিত না। যাহা প্রকৃতির দান তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিত। নিবার ধান্য বিনা চাষেই পাওয়া যাইত। প্রাচীন আর্যরা এই নিবার ধান্যের চাল বোধহয় নখ ও দাঁত দিয়া বাহির করিত। মীমাংসা শাস্ত্রে ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই জন্যই বোধহয় পরবর্তী যুগে নিবার ধান্য হইতে উৎপন্ন চাল পবিত্রতম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সে সময় তাহারা পশু শিকার করিয়া পশু মাংস কেমন করিয়া যে ভক্ষণ করিতেন, তাহার কোন পরিচয়ই দেওয়া হয় নাই। বোধহয় কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াই সত্যযুগের বর্ণনা রচিত হইয়াছিল। সত্যযুগের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে সে যুগের মন নিরীহ, শান্ত ও সমাহিত ভিন্ন আর কিছুই নয়। এহেন সমাজেও যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল না তাহা অনিচ্ছাসত্বেও স্বীকার করিতে হইয়াছে। তখন স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ যে কিরূপ ছিল তাহা অনুমান করিয়া ও কল্পনার সাহায্যে বুঝিতে হইবে।

ঋগ্বেদে যখন বিবাহ প্রথা প্রচলিত করা হইতেছে, তখন নববধূকে শ্বশুরকুলে সম্রাজ্ঞী হও বলিয়া আশীর্বাদ করা হইতেছে। ইহা হইতে বুঝা যায় বিবাহের পর নারীর অধিকার সঙ্কুচিত হইল বটে কিন্তু তাহার সামাজিক গৌরব

ক্ষুণ্ণ হইল না। সুতরাং তাঁহার নূতন সমাজ ব্যবস্থা গ্রহণ করার পক্ষে কোন যুক্তি সঙ্গত আপত্তিই থাকিতে পারে না ; বরং বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণের জন্য এই নূতন ব্যবস্থা সাদরে গ্রহণ করাই কর্তব্য। কিন্তু আমরা পুরাণাদি গ্রন্থ এবং অন্যান্য বহু ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থে অপ্সরা, কিন্নরী, প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাই। তাঁহারা এই বিধি মানিয়া লইলেন না। অথচ পরবর্তী সমাজে গণিকাদের বারবণিতা বলিয়া যে নিন্দাসূচক সংজ্ঞা দেওয়া হইল, তাহা কিন্তু অপ্সরা প্রভৃতিদের পক্ষে প্রযোজ্য হইল না। ইহা হইতে মনে স্বতঃই কী ধারণা জন্মায়? প্রাচীনকালে একদল নারী এই নূতন অবস্থা মানিয়া লইতে অস্বীকার করিলেন। পুরাণ রূপকের সাহায্যে কল্পিত স্বর্গরাজ্যে তাহাদের অপ্সরারূপে বর্ণনা করিয়াছে। কিন্তু আসল যে বিষয়টি বিচার করা উচিত ছিল, সেটি সম্বন্ধে এই সব গ্রন্থকর্তারা সযত্নে মৌনাবলম্বন করিলেন ; অর্থাৎ প্রাক-বিবাহ যুগের নারীদের মনে কী কী বৃত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল এবং বিবাহোত্তর যুগে নারীর মনে কোন বৃত্তি তিরোহিত হইল এবং কোন অভিনব বৃত্তি বিকশিত হইল। নারীর এই মানসিক বিবর্তনের ফলে তাহাদের কতকাল ধরিয়া কেমন অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘটিয়াছিল এবং তাহার স্থিতিকালই বা কতদিন ধরিয়া ছিল, তাহার কোন পরিচয় স্পষ্ট ভাষায় পাওয়া যায় না। বৃহস্পতি বয়সে প্রাচীন, জ্ঞানেও বৃদ্ধ। তাঁহার রূপবতী ভার্যা তারা অতি প্রিয়দর্শন চন্দ্রকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি স্বামীর অনুমতি লইয়াই চন্দ্রের গৃহে গেলেন। কিন্তু স্বামীর বহু অনুনয় সত্বেও আর স্বামী-গৃহে ফিরিতে চাহিলেন না। এই গল্পটির আসল বক্তব্য কী? ইহা কী নারীর স্বাধীনতার জন্য যে ব্যাকুলতা তাহারই ইঙ্গিত করে না? বিধি ব্যবস্থার দ্বারা মনকে যন্ত্রিত করিয়া পঙ্গু করা যায়, কিন্তু মনের স্বাভাবিক বিকাশে সাহায্য করা যায় না। যে মন স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছে, সে মন নব কৃত্রিম বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে স্বাভাবিক ভাবে যে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। বিবাহ ব্যবস্থা যে পূর্ব ব্যবস্থার চেয়েও ভাল তাহা কোন গ্রন্থেই সুবিন্যস্ত যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত করা হয় নাই। অর্থাৎ নারী পুরুষের মনের ক্রম পরিণতির ফলে বিবাহ প্রথা অবশ্যম্ভাবীরূপে আসে নাই। এই জন্য এই প্রথা প্রচলনের জন্য কৃত্রিম শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইল। এবং এই ব্যবস্থার নানা গুণ কীর্তন করিয়া নারী মনকে ইহা গ্রহণ করিতে প্রলুব্ধ করাও হইল। এক কথায় ভয় ও প্রলোভন—এই দুই অস্ত্রের সাহায্যে বিবাহ প্রথা আর্যসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

আর্য পুরুষ দলবদ্ধ থাকা অবস্থায় যে সামাজিকতা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল, সেই সামাজিকতা কী পরবর্তীকালে অক্ষুন্ন ছিল? যে কথাটি আমি বলিতে চাহিতেছি সেটি এই : তখন সকলে একত্রে অবস্থান ভোজন শয়নাদি সকল কার্যই করিতেন। অর্থাৎ ভূমি তখন সাধারণ-সম্পত্তি। বৃক্ষজাত ফলগুলি সাধারণ ভোগ্য। মৃগয়ালব্ধ মাংস সাধারণ ভক্ষ্য। নারী-পুরুষের সম্পর্ক চিত্তের স্বাভাবিক গতির দ্বারাই স্থাপিত হইত। অর্থাৎ পরস্পর-অনুরাগই মিলন সূত্র। কোন বাহিরের বিধির প্রয়োজন হইত না। সামাজিক ব্যাপারে নারী-পুরুষের মতের একই মূল্য ছিল। যে মতটি যুক্তির গভীরতায় গ্রাহ্য বলিয়া মনে হইত, তাহাই গৃহীত। সে মত পুরুষের কি নারীর, তাহা লইয়া আলোচনার কোন অবসরই সে সমাজে ছিল না। এই যে নারীর স্বাধীন মন, যে মন নির্ভয়ে নিরুদ্বেগে অন্যের মুখের দিকে না চাহিয়া আপন মত ব্যক্ত করিত, এবং যে সমাজে পুরুষও পুরুষের তুল্য সম্মান দিয়া নারীকে গ্রহণ করিত, সেই সমাজের উত্তরাধিকারিণী নারী অকুণ্ঠিত চিত্তে এই বিবাহ বিধি স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া কী লইতে পারে? এই বিবাহের উজ্জ্বল দিকের চিত্রটি বৈদিক মন্ত্র সমূহে তুলিয়া ধরা হইয়াছে, কিন্তু আর একটি দিক আছে, সেটির কথা সযত্নে গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে। নারী তাহার পূর্ব গৃহ হইতে নিঃসম্পর্ক হইয়া পতি গৃহে যাইতেছেন। এ যেন গাছের কলম বাঁধা। এই অবস্থায় শ্বশুর গৃহ যত রমণীয়ই হোক না কেন, আসল সন্ধিস্থল হইল স্বামী। স্বামীর সহিত পূর্ব পরিচয় হয়ত নব বধূর ছিল না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যে থাকে না, তাহা 'কন্যা' এই নামই জানাইয়া

দিতেছে। এই যে সম্পূর্ণ অচেনা পরিবেশ, সেখানে ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে নিজেকে সীমিত করিয়া রাখার প্রবৃত্তি কী কোন নারীর স্বাভাবিক নিয়মে আসে ?

দ্বিতীয় কথা, পুরুষের দিক একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাক। পুরুষের বিবাহের পরে নারীর গৃহে গিয়া (নারী যে অবস্থায় শ্বশুর বাড়ীতে থাকে সে অবস্থায়) থাকার বিধি হইল না কেন ? এই যে নিয়ম, যে স্ত্রীকে শ্বশুর গৃহে যাইতেই হইবে, এ নিয়ম পুরুষের প্রতি প্রয়োজ্য হইল না কেন ? নারীর সমাজ আমাদের সামাজিক জীবনে প্রাধান্য লাভ করে না। পার্বত্য অঞ্চলে, যেখানে পশু শিকারই প্রধান বৃত্তি সেখানে পুরুষের সামাজিক প্রাধান্য লাভ সহজেই অনুমেয়। কারণ নারী স্বাভাবিক নিয়মে জীবনে কয়েকটি অবস্থায় অক্ষম হইয়া পড়ে, সে সময় অপরের উপর নির্ভর তাহাকে করিতেই হয়। সন্তান পালনের জন্য নারীর চিত্তে কোমলতা স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া প্রস্ফুটিত হয় ঃ ইহা না হইলে মনুষ্য সমাজ এত সযত্নে রক্ষিত হইত না। সুতরাং হিংসাবৃত্তির প্রতি প্রবল আসক্তি নারী হৃদয়ে ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু স্বাভাবিক নয়। বন্যপশু হইতে আত্মত্রাণের ও অপর ব্যক্তিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হিংসাবৃত্তির মূল্যও অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং এই বৃত্তিরস্ফুরণ এবং অস্ফুরণ পুরুষের প্রাধান্য লাভ এবং নারীর অপ্রাধান্য লাভের কারণ বলিয়া কল্পনা করিলে খুব অসঙ্গত হয় না বলিয়াই মনে হয়।

যৌথভাবে থাকাকালীন পুরুষ আর্য সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল কার্যের দ্বারা। পরযুগে এই আর্য দল যখন ভারতের সমতল ভূমিতে বিজেতারূপে আপনাদের প্রতিষ্ঠিত করিল, তখন তাহাদের সেই যৌথ থাকার ব্যবস্থা ভাঙিয়া গেল। সাবেক দৃঢ় সামাজিক বন্ধন শিথিল হইয়া গেল। কৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ নূতন সমাজের পত্তন হইল। এই বিজয়াভিযানে নারীর ভূমিকা বোধ হয় পুরুষের সঙ্গে তুলনায় নগন্য। এইজন্যই সম্পত্তি যেমন বিভক্ত হইতে লাগিল, পুরুষের স্বামিত্ববোধ উগ্র হইয়া উঠিল। নিজেই আমি ভোগ করিব। অথবা অপর যাহাকে আমি ভোগ করিবার সুযোগ দিব, সেই ভোগ করিবে। পুরুষের এই স্বামিত্ববুদ্ধি এমনই সর্বগ্রাসী হইল। ভূমি, পশু-পক্ষী প্রভৃতির উপর যেমন আমার প্রভুত্ব তেমনই প্রভুত্ব আমার প্রতিপাল্যদের উপর। স্ত্রী এখন কর্মের সাথী নয়—প্রতিপাল্য নারী মাত্র।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে শুনঃশেফকে তাঁহার পিতা ঋষি হইয়াও রাজার নিকট বিক্রয় করেন। রাজার যজ্ঞীয় পশু অপহৃত হয়। যাজ্ঞিকরা বলেন পশুর বিনিময়ে কোন মনুষ্যকে বলি দিতে পারিলে যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইবে। ঋষি-পিতা যদি পুত্রকে বিক্রয় করেন, তাহা হইলে অন্য লোকে কী করিবে পাঠকগণ তাহা নিজেরাই বিবেচনা করিয়া দেখুন। এই পুত্রের উপর পিতার যদি সম্পত্তির মতো স্বত্ব না থাকে, তাহা হইলে বিক্রয় কার্যটি হইতে পারে না। সেই সময় দ্যূতে স্ত্রীকে পণ রাখিয়া অক্ষক্রীড়া হইত। ইহারই জের আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই। দাসদাসীর উপরে সর্বতোমুখী প্রভুত্ব মনিবের ছিল। সুতরাং সেই সময়কার দাসদাসী অনেকটা ক্রীতদাসের সমপর্যায়েই যে ছিল, তাহা না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে নাকি ?

এই প্রচণ্ড স্বত্ববুদ্ধি সব সময়েই সমাজে অনর্থ ঘটায়। পরযুগে এই শিষ্টাচার সমাজের ধর্মসঙ্গত শাসনবিধিতে পরিণত হয়। মনুসংহিতাদি গ্রন্থ দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে, শূদ্রের শুধু সেবারই অধিকার দেওয়া হইয়াছে। বৈদিকযুগে যাহারা দাস ছিল, অর্থাৎ যে সব অনার্য বিজিত হইয়া দাসত্ব বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল তাহারা মনিবদের জমি চাষ করিয়াই জীবন সার্থক করিত। ফসলের উপরে তাহাদের কোন অধিকারই ছিল না। শুধু উদর পূরণের মত অতি নিকৃষ্ট ধরণের খাদ্য পাইত। পরিধেয়র কথা ইহা হইতেই সহজে অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। আর্যদের এহেন সুন্দর ব্যবস্থাকে ভগবৎ প্রেরণালব্ধ বিধি না বলিয়া আর উপায় কী ?

ঠিক এইভাবেই আর্য মনিবেরা দাসীদিগের সহিত উচ্ছৃঙ্খল ভাবে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করিতে কোন দ্বিধা

বোধ করেন নাই। তাহারই ফলে আমরা শুক্ল যজুর্বেদে ডজনখানেকেরও অধিক শংকর জাতির উল্লেখ দেখিতে পাই। সন্তানের পিতৃত্বার্জনে মনে কোন সঙ্কোচ বা গ্লানি আসে না ঃ—কিন্তু তাহাদিগকে পিতার সমতুল্য মর্যাদা দিতে গেলেই যত কিছু ওজর আপত্তি। সুতরাং ভগবানের দোহাই না দিয়া আর কী করিয়া ভিন্ন ব্যবস্থা করা যাইতে পারে? সকল অসামঞ্জস্যে, একমাত্র উত্তর ভগবৎ প্রেরণা বা ভগবৎবাণী। এ ভগবৎবাণী, না আত্ম-প্রবঞ্চনারবাণী? যুক্তির নিকষ এই সব ব্যাপারে অচল করিয়া না ফেলিলে অকার্যগুলি ঢাকিয়া সততার প্রলেপ কী করিয়া দেওয়া যাইবে?

এইজন্য এই সময়ে আমরা দেখি, যে সব স্বামী অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া পশুত্বের গভীর অধঃস্থলে নামিয়া গিয়াছে, যাহারা লোকের কাছে আর ঋণ পায় না, পাওনাদারের ভয়ে গা ঢাকাদিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, রাত্রে চুরী করিয়া অক্ষক্রীড়ার পয়সা যোগাড় করে—সেই সব স্বামীকে স্ত্রীরা স্বামিত্বে স্বীকৃতি দেন না। স্বামী পরম দেবতা—এই মতবাদটি আর্য নারীদের ঠিক হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। তাহাদের শিরায় তখনও স্বাধীনতার রক্ত কণাবশিষ্ট হইলেও, বহিতেছে।

পুরুষের বহু বিবাহের কথা স্পষ্ট ভাবে লেখা না থাকিলেও, বহু বিবাহ যে প্রচলিত ছিল তাহার স্বপক্ষে আমরা অকাট্য প্রমাণ দিতে পারি। ইন্দ্রাণীর স্বপত্নী দমনের মন্ত্র ও ঔষধাদির ব্যবস্থা নিরর্থকই হইত, যদি সমাজে বহু বিবাহের প্রচলন না থাকিত। অশ্বমেধযজ্ঞে রাজার তিনটি ভিন্ন জাতীয় রাণীর উল্লেখ দেখা যায়। সেই সময় রাণীদের সহিত পুরোহিতের যে সব অশ্লীল আলাপ দেখা যায় তাহা একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবিলে মনে হয় সে সমাজে নৈতিকবোধ শুধু তোলা পোষাকের মত ছিল। এই অবস্থা কী রূপে হইল?

পূর্বে সমাজে নারী এবং পুরুষের আত্মমর্যাদাবোধ তুল্য ছিল। নারী তাহার খুশিমত চলিতে পারিত, পুরুষও সেইভাবেই চলিত। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনপক্ষেরই আত্ম সমর্পনের কথা গৌরবের বলিয়া গৃহীত হয় নাই। বরং নিন্দিতই হইত। এই মর্যাদাবোধের সুষ্ঠু পরিণতি বোধ হয় গান্ধর্ব্য বিবাহ; অর্থাৎ পরস্পরের প্রণয়ই এই মিলনের একমাত্র ভিত্তি। এবং এই প্রণয়কে স্থায়ী করিবার ব্যবস্থাই বিবাহবিধি। সে যুগে পুরুষের দিকে বাঁধনের কতটা জোর ছিল এবং নারীর দিকেই বা এ বাঁধনের দৃঢ়তা কতটা ছিল তাহা জানিবার আজ আমাদের পথ নাই।

যে বিধি স্বাভাবিক নিয়মে গড়িয়া উঠিতেছিল, যাহাতে নারীত্ব বা পুরুষত্বে কোন কলুষ ছাপ পড়ে নাই, সেই বিধি কেন হঠাৎ সর্বজনগ্রাহ্য হইল না? পরে যে বিবাহবিধি দেখা যায়, তাহাতে পুরুষের কোলেই বেশি করিয়া ঝোল টানা হইয়াছে। এই পক্ষপাতিত্ব কেন? পক্ষপাতিত্বের মূলে আছে পশুশক্তি। মানুষের উপর আধিপত্য, সম্পত্তি করায়ত্ব এবং সম্পদ কুক্ষিগত করার প্রতিযোগিতায় নারী টেক্কা দিয়া পুরুষেরসঙ্গে চলিতে পারে না। শোষণের মনোবৃত্তি নারীর ঠিক স্বাভাবিক নয়। কারণ যিনি সন্তানের জননী হইবার একমাত্র অধিকারিণী, যিনি প্রকৃতির বিধানে নিজের রক্ত এবং আহারের সারভাগ দিয়া নিজ সন্তানকে পালন করেন, তিনি রোগগ্রস্ত হইলে অথবা কোন একটা অবস্থা বিশেষের চাপে না পড়িলে এমন দায়িত্বহীনভাবে ভোগ সর্বস্ব হইতে পারেন না। নারীর প্রকৃতিতে আছে কোমলতা।

বেদে হিংস্র একদল নারীর উল্লেখ দেখিতে পাই। তাঁহারা স্বাধীনভাবে থাকিতেন। এবং পুরুষেরা সেখানে ভৃত্যের কাজ করিত। অর্থাৎ পুরুষপ্রকৃতিসম্পন্ন এই নারীর দল। বৈদিক সাহিত্যে দু'এক জায়গায় উল্লেখ ছাড়া, তাহাদের সমাজবিধি, ক্রিয়া-কলাপ, প্রভৃতির কোন সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না। অনার্য সমাজের যে অংশ আর্যদের নিকট বশ্যতা স্বীকার না করিয়া নিজেদের, স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিল তাহারা গভীর জঙ্গল, দুর্গম

পার্বত্য অঞ্চল, প্রভৃতি দুর্ভেদ্যস্থল আশ্রয় করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। এই সমাজের সুষ্ঠু পরিচয় পাইবার কোন গ্রন্থ দেখি না। কিছু সূত্র ধরিয়া ইহাদের সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলিবার চেষ্টা করিব।

মাতৃনামানুসারে নাম বেদের বহু জায়গায় আমরা দেখিতে পাই। 'দৈত্য' এই শব্দটি এই ঐতিহ্য বহন করিয়া চলিতেছে। অর্থাৎ ইহারা দিতির পুত্র। দেবতাদের মধ্যে শুধু 'আদিত্য' ছাড়া আর কাহারও মাতৃনামে পরিচয় দেখি না। অদিতি অখণ্ডিতা ভূমি। তখন পিতৃশাসনের প্রবর্তন উগ্রভাবে তখনও কোন সমাজেই হয় নাই। এই জন্যই বোধহয় অতি প্রাচীনকালে আর্যদের মধ্যে কিছু কিছু মাতৃপরিচয় পাওয়া যায়। পরে আর্য সমাজে যখন মাতার সামাজিক জীবনে মর্যাদার অবনতি ঘটিল ও পিতৃশাসন নিজের পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিল তখন গোত্র, প্রবর, প্রভৃতি দেখা দিল। শাস্ত্রবাক্য আমাদের মনে এমনভাবে জাঁকিয়া বসিয়াছে, যে আমরা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে প্রাচীন সমাজকে বুঝিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করি।

একদিকে পিতৃশাসন কায়েম করা হইল, অপরদিকে মাতৃশাসনের বিভিন্নভাবে কুৎসা প্রচার করা হইতে লাগিল। আমার মনে হয়, যে অঞ্চলে মাতৃশাসন প্রচলিত ছিল সেই অংশের নারী কর্তৃদের হিংস্র প্রকৃতির বলা হইয়াছে। নিন্দা করার চেয়েও আর্যঋষিরা এই ব্যবস্থা শ্রেয় মনে করিলেন। বোধহয় এই জন্যই বেদে এই সমাজের সকল সংবাদই ধামা চাপা রহিল।

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিলে অধিকার
হে বিধাতা ?
নত করি মাথা
পথপ্রান্তে কেন রব জাগি
ক্লান্তধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে !
শুধু শূন্যে চেয়ে রব ? কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ।"

—রবীন্দ্রনাথ।

ঘুমের শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য

আই, পি, পাভলভ

তথাকথিত শর্তাধীন পরাবর্ত সম্পর্কিত গবেষণাকালে আমাদের প্রায়শঃই নিদ্রাবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। এই পরিস্থিতি যেহেতু আমাদের পরীক্ষাকার্যকে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া এবং স্বাভাবিক পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া বহুলাংশে জটিল করিয়া তুলিতেছিল সেই হেতু, স্বভাবতঃই আমরা সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে বাধ্য হই। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা ছাড়াও আমাদের দুইজন সহকর্মী এন এ রোজান্সকি ও এম কে পেত্রোভা—এই সমস্যা লইয়া অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে বিস্তৃত অনুশীলন করেন। এন, এ, রোজান্সকি নিদ্রা বা তন্দ্রাবস্থার যে রূপ লইয়া পরীক্ষা করেন আপাত দৃষ্টিতে তাহা বৈচিত্র্যহীন কৌতুহলশূন্য উদ্দীপক হইতে সৃষ্ট, যেমন পরীক্ষিত জীবটি যে নিঃসঙ্গ পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত হইয়াছে সেই পরিবেশ। জন্তুটিকে একটি বিচ্ছিন্ন কক্ষে আবদ্ধ করিয়া পরীক্ষামঞ্চে রাখিয়া দিলে, সে ধীরে ধীরে তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়ে এবং পরে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়। নির্দিষ্ট এবং সক্রিয় উদ্দীপকসমূহ যাহা হইতে জোরাল শর্তাধীন উদ্দীপকগুলি সম্প্রসারিত হইয়াছে, সেগুলির প্রভাবেও ঘুম আসে। এই উদ্দীপকগুলির প্রভাবে সকল কুকুরের মধ্যেই নিদ্রালু সম্মোহিতাবস্থার সৃষ্টি হয়, এবং তাহাদের কতকগুলির মধ্যে তো অতি সহজেই তাহা ঘটে। সম্প্রতি ডঃ এল এন ভোস্ক্রেসেন্সকি এই তন্দ্রালু অবস্থার একটি ঘটনা পান যাহা আমাদের কাছে একটু অপ্রত্যাশিতই ছিল, কারণ এই কুকুরটির ওপর ডঃ এ এম পাভলোভা ইতিপূর্বেই অসংখ্য পরীক্ষা চালান এবং ঐ পরীক্ষাগুলির সময়ে ঘুমের কোনও উল্লেখযোগ্য লক্ষণ দেখা যায় নাই। কিন্তু এই সময়ে আমাদের গবেষণার মাঝখানে অপ্রত্যাশিতভাবে ঘুম আসিয়া অন্তরায় হইল এবং শর্তাধীন পরাবর্ত লইয়া আমাদের গবেষণা ব্যাহত করিতে লাগিল, তাহার ফলে সাধারণভাবে সংঘটিত ব্যাপারগুলি কখনও সম্পূর্ণতঃই অনুপস্থিত থাকিত আর কখনও বা বিকৃতাবস্থায় উপস্থিত হইত। ইহা কিরূপে ঘটিল ? প্রথমে আমরা এবিষয়ে খুব নিশ্চিন্ত ছিলাম না যে, এই অবস্থা প্রকৃতই ঘুম কিনা এবং এই বাধাগুলির অন্য অনেক কারণ রহিয়াছে বলিয়া ভাবিলাম। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ এবং নানাবিধ পরীক্ষার ফলে অন্য কোন অনুমানের অবকাশ রহিল না। কুকুরটির মধ্যে নিদ্রাবস্থা সৃষ্টি হইবার কথা স্বীকার করিয়া লওয়াই একমাত্র পথ রহিল। কিন্তু ইহা ঘটিল কি কারণে ? অতঃপর আমরা যখন কুকুরটির উপর অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক পরীক্ষাগুলির বিস্তারিত বিবরণীগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করিলাম তখন দেখা গেল যে, ঘুমের কারণগুলি নিম্নরূপ। এই বিশেষ সময়ের পূর্বে, সাধারণভাবে কুকুরকে মঞ্চে রাখিবার সঙ্গে সঙ্গেই পরীক্ষা শুরু হইত—কুকুরটিকে বিশেষ শর্তাধীন উদ্দীপকের ক্রিয়াধীন করা হইত এবং শর্তহীন উদ্দীপকরূপে দেওয়া হইত খাদ্য। এই অবস্থাগুলি ঘুমন্ত অবস্থা সৃষ্টি করিত না। কিন্তু এখন কতকগুলি আনুষঙ্গিক অবস্থার কারণে কুকুরটিকে পূর্বের তুলনায় দীর্ঘতর সময়ের জন্য পরীক্ষা আরম্ভ হইবার অপেক্ষায় মঞ্চে রাখিয়া দেওয়া হইত। নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্রিয়াশীল এই একঘেয়ে পরিবেশই ক্রমশঃ ঘুমন্ত অবস্থা সৃষ্টির হেতু। এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই প্রমাণিত হইল। যেহেতু নিদ্রাবস্থা সৃষ্টি সম্পর্কিত বিশদ তথ্যাদি

আমাদের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাই আমরা এই প্রশ্নটি লইয়া পরম অধ্যবসায়ের সহিত পরীক্ষা করিবার সিদ্ধান্ত করি।

প্রথমেই ইহা প্রতীয়মান হইল যে, পরিমাণগতভাবে পরিবেশের প্রতিক্রিয়া বিস্ময়কর নির্ভুলতার সহিত কাজ করে, যেমন, যদি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই (বিভিন্ন ফানেলগুলি ঠিক করা, যন্ত্রটি বাঁধা ইত্যাদি) পরীক্ষা অর্থাৎ জন্তুটির নিত্যকার উদ্দীপকগুলির প্রয়োগ, আরম্ভ করা যায় তবে কুকুরটির মধ্যে নিদ্রার কোনই লক্ষণ দেখা যায় না। কিন্তু যদি প্রস্তুতি পর্ব শেষ হওয়া এবং উদ্দীপকের ব্যবহার সুরু করার মাঝখানে এক মিনিটও অতিবাহিত হয় তবে নিদ্রার প্রথম অবস্থার লক্ষণগুলি প্রকাশমান হয়। যদি দশ মিনিট অতিবাহিত হয়, তবে নিদ্রার পরবর্তী পর্যায় লক্ষ্য করা যায় এবং এইভাবে ঘটিয়া চলে, অর্থাৎ পরিবেশের নিদ্রা সৃষ্টিকারী প্রভাবকে সত্যই পরিমিতভাবে প্রয়োগ করা যায়। ইহার ফলে এই ধরণের অবস্থার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নিদ্রাবস্থার সৃষ্টি কিভাবে হয় তথা নিদ্রাবস্থার বিভিন্ন পর্ব অনুশীলন করা আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য হইল। আমাদের পর্যবেক্ষণের ফলে নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়া গেল। আমাদের পরীক্ষাকালে সাধারণতঃ আমরা পশুটির দুই ধরণের প্রতিক্রিয়ার উপর নজর রাখিয়াছি। একদিকে ক্ষরণ প্রতিক্রিয়া (secretory reaction) লালাক্ষরণ, (flow of the saliva) এবং অপর দিকে সঞ্চালন প্রতিক্রিয়া (motor reaction) খাদ্যবস্তু দেওয়া হইলে কুকুরটি তাহা তুলিয়া লয়। এই দুইটি প্রতিক্রিয়াকেই সঞ্চালন ও ক্ষরণ পরাবর্ত (secretory and motor reflexes) বলা হয়। দেখা গেল যে পর্যবেক্ষিত বস্তুগুলির সম্পূর্ণ নিয়মানুগভাবে প্রকাশ নির্ভর করে নিদ্রা-উদ্রেককারী পরিবেশের পরিমাণগত প্রভাবের উপর। নিম্নলিখিত তালিকায় তাহা নির্দিষ্ট হইতেছে।

কুকুরের অবস্থা	নিদ্রার পর্যায়	পরাবর্ত		মন্তব্য
		ক্ষরণ	সঞ্চালন	
জাগ্রত ...	...	+	+	
	ক	−	+	
ঘুমন্ত	খ	+	−	গভীর নিদ্রা
	গ	−	-	
	খ	+	−	
	ক	−	+	
জাগ্রত ...	...	+	+	

জাগ্রত অবস্থায় ক্ষরণ ও সঞ্চালন উভয় পরাবর্তই উপস্থিত থাকে। শর্তাধীন উদ্দীপক কাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই লালাক্ষরণ সুরু হয় এবং খাদ্য দেওয়া মাত্র কুকুরটি তাহা গ্রহণ করে। এইভাবে দুইটি পরাবর্তই সক্রিয় থাকে। এরপর কুকুরটিকে যদি অন্ততঃ দুই মিনিট কাল পরিবেশের প্রভাবাধীন রাখা হয় অর্থাৎ পরীক্ষার প্রস্তুতি শেষ হওয়ার পর যদি দুই মিনিট অতিক্রান্ত হয় এবং তাহার পর শর্তাধীন উদ্দীপক প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে নিদ্রাবস্থার প্রথম পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। এর লক্ষণগুলি এইরকম :—

ক্ষরণ পরাবর্ত্ত অদৃশ্য হইয়া যায় ; শর্তাধীন উদ্দীপক আর কাজ করে না ; কিন্তু কুকুরটিকে যদি খাদ্য দেওয়া হয় তবে সে সেই মুহূর্তে তাহা তুলিয়া লয়। তাহা হইতে প্রমাণ হয় যে সঞ্চালক পরাবর্ত তখনও সক্রিয়। এইবার

পরিবেশের প্রভাব বৃদ্ধি করা যেমন, পরীক্ষা আরম্ভ করার আগে দশ মিনিটকাল কুকুরটিকে অপেক্ষা করাইয়া রাখা যাক্। সে ক্ষেত্রে নিদ্রা গভীরতর হয় এবং এক ধরণের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় যাহা অদ্ভুত, বিপরীত ধরনের এবং এই অবস্থাকে নিদ্রাবস্থার দ্বিতীয় পর্য্যায় বলা যায়। কুকুরটির লালাক্ষরণ হয় কিন্তু খাদ্য গ্রহণ করে না এমন কি খাদ্য হইতে মুখ সরাইয়া লয়। অর্থাৎ প্রথম পর্য্যায়ে লালাক্ষরণরূপ যে প্রতিক্রিয়াটি অপসারিত হইয়াছিল তাহা দ্বিতীয় পর্যায়ে পুনরায় উপস্থিত হয়। অপর দিকে সঞ্চালণ প্রতিক্রিয়া অপসারিত হয় এমন কি বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ায় পরিণত হয়। কুকুরটি যে শুধু খাদ্য প্রত্যাখ্যান করে তাই নয়, খাদ্য হইতে মুখ সরাইয়া লয়। পরীক্ষা আরম্ভের আগে ঘুমের পরিবেশে আধঘন্টা হইতে একঘন্টা পর্যন্ত যদি কুকুরটিকে ফেলিয়া রাখা হয় তবেসম্পূর্ণ ও গভীর নিদ্রার পর্য্যায় শুরু হয় এবং দুইটি পরাবর্তই অপসারিত হয়। এইবার কুকুরটিকে এই গভীর নিদ্রা হইতে জাগানো হউক। ইহা এক মুহূর্তেই করা যায় উদ্দীপক হিসেবে সহজতম পন্থা হইল, সজোরে আওয়াজ করা। ল্যাবরেটরীতে আমরা একটি প্রচণ্ড শব্দকারী ঝুম্‌ঝুমি ধরণের জিনিস ব্যবহার করি যার আওয়াজে কুকুরটি সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া ওঠে, পশুটি তৎক্ষণাৎ স্বাভাবিক জাগ্রত অবস্থায় ফিরিয়া আসে, অবশ্য অন্য উদ্দীপক ও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ধীরে ধীরে ঘুম ভাঙানোর জন্য একটি চলতি পদ্ধতি হইল কুকুরটিকে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে খাওয়াইয়া যাওয়া। প্রথমে জোর করিয়া মুখের মধ্যে খাবার ঢুকাইয়া দিতে হইতে পারে। অতঃপর পূর্ববর্ণিত লক্ষণগুলি বিপরীত পর্যায়ক্রমে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। গভীর নিদ্রার পর ক্ষরণ পরাবর্ত উপস্থিত কিন্তু কুকুরটি খাদ্য গ্রহণ করে না। পরে ক্ষরণ পরাবর্ত অপসারিত হয় কিন্তু কুকুর খাদ্য গ্রহণ করে। এবং পরিশেষে পুনঃ পুনঃ খাদ্য দিতে থাকায় উভয় পরাবর্তই ফিরিয়া আসে। এইবার কতকগুলি প্রামাণ্য সংখ্যার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উদাহরণ স্বরূপ একটি কুকুরের কথা ধরা যাক যাকে সবেমাত্র পরীক্ষা মঞ্চে বাঁধা হইয়াছে। কুকুরটিকে কিছু শর্তাধীন উদ্দীপক দেওয়া হইতে থাকিল এবং লালাক্ষরণ দেখা দিল। আমরা হিসাবের জন্য যে ‘স্কেল’ ব্যবহার করিতেছি তাহার ৩৭টি বিভাগ আছে যাহা স্বাভাবিক লালাক্ষরণ প্রতিক্রিয়ার সূচক। উল্লেখ করা উচিত যে, আমাদের অনুসন্ধান কার্য্যে নির্ভুলতা সুনিশ্চিত করিবার জন্য আমরা নিম্নলিখিত সতর্কতা অবলম্বন করি। কক্ষটি নিজেরই কুকুরটির উপর সম্মোহনী প্রভাব ছিল। এই প্রাণবন্ত ছটফটে, প্রতিবেদনশীল প্রাণীটিকে পরীক্ষা কক্ষে আনার সঙ্গে সঙ্গেই সে একেবারে বদলাইয়া যাইত। বলা বাহুল্য যে, কুকুটিকে যখন মঞ্চে রাখিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা হইত তখন নিদ্রাবস্থা গভীরতর হইত। জাগ্রত অবস্থা হইতে নিদ্রাবস্থায় পরিণতির ঠিক মুহূর্তটি নিরূপণ করার জন্য মঞ্চে বাঁধা এবং যন্ত্র সংযোগের সময় কুকুরটি যাহাতে ঘুমাইয়া না পড়ে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইত। সেই সময় কুকুরটিকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিয়া জাগাইয়া রাখা হইত। সব প্রস্তুত হওয়ামাত্র আমরা পরীক্ষা কক্ষ ত্যাগ করিয়া আমাদের গবেষণার কাজ সুরু করিয়া দিতাম। এইভাবে আমরা ‘স্কেলের’ ৩৭ বিভাগে কুকুরের স্বাভাবিক লালাক্ষরণ প্রতিক্রিয়ার পরিমাপের তথ্যটি সংগ্রহ করিয়াছি; এই সময় সঞ্চালক পরাবর্তও বর্তমান ছিল। পরবর্তী পরীক্ষায় অমারা দুই মিনিটকাল কুকুরটিকে পরিবেশের প্রতিক্রিয়াধীন রাখিয়া নিম্নলিখিত ফলাফল লক্ষ্য করিয়াছি। লালাক্ষরণ পরাবর্ত দেখাই গেল না; আমাদের শর্তাধীন উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া হিসাবে এক ফোঁটা লালাও ক্ষরণ হইল না কিন্তু খাদ্য দেওয়া হইলে কুকুরটি সঙ্গে সঙ্গে খাইল। এরপর চার মিনিটকাল পরিবেশের প্রতিক্রিয়াধীনে কুকুরটিকে রাখা হইল। ‘স্কেলের’ ২২ বিভাগ পরিমাণ লালাক্ষরণ পাওয়া গেল কিন্তু খাদ্য দেওয়া হইলে কুকুরটি ৪৫ সেকেণ্ডের পর তাহা খাইল এবং তাও কুকুরের মুখে খাদ্যের স্পর্শ লাগিবার পর। এবং পরিশেষে আধ

ঘণ্টা হইতে একঘণ্টা পর্যন্ত কুকুরকে পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার অধীনে রাখা হইলে সকল পরাবর্তই অপসারিত হইয়া গেল।

একই পরীক্ষায় যাহাতে নিদ্রার দুইটি পর্যায়ই লক্ষ্য করা যায় সেজন্য আমরা অবশ্য পরীক্ষা পদ্ধতির প্রয়োজনীয় অদল-বদল করিয়াছি। যেমন, কুকুরটিকে ২৫ সেকেণ্ডকাল পরীক্ষাকক্ষে রাখা হইল। ফলে ক্ষরণ পরাবর্ত সম্পূর্ণ অপসারিত হইল কিন্তু খাদ্য দেওয়া হইলে কুকুরটি তৎক্ষণাৎ খাইল। পরে, আমরা একঘণ্টা কাল কুকুরটিকে নির্জন কক্ষে রাখিলাম। একবারমাত্র খাদ্য দেওয়ার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কুকুরটির মধ্যে যে উদ্দীপনা হইল তাহা পরিবেশের নিদ্রা আনয়নকারী ক্ষমতাকে খানিকটা ঠেকাইয়া রাখিল এবং এইসময় শুধুমাত্র দ্বিতীয় পর্যায়ের লক্ষণ দেখা গেল। লালাক্ষরণের পরিমাপ হইল ২২ বিভাগ এবং খাদ্য মুখে দেওয়ার আধ মিনিটের মধ্যে কুকুরটি তাহা খাইল। ঘুম কিভাবে ভাঙা হয় তাহার আরেকটি উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। কুকুরটি গভীর ঘুমে রহিয়াছে এবং উহাকে জাগাইবার জন্য আমরা অন্যান্য প্রক্রিয়ার সাথে সাথে একটি দুর্বল উদ্দীপক ব্যবহার করিলাম। কুকুরটি যে কক্ষে বাঁধা রহিয়াছে সেখানে একজন প্রবেশ করিলেন। কক্ষে প্রবেশ করার জন্য যে সামান্য আওয়াজ হইল এবং সম্ভবতঃ প্রবেশকারীর গন্ধ সব মিলিয়া কুকুরের নিদ্রাবস্থাকে সামান্য ব্যাহত করিল। এই সময় শর্তাধীন পরাবর্ত ব্যবহার করিলে লালাক্ষরণের পরিমাপ ২৪ বিভাগ পাওয়া যায় কিন্তু কুকুরটি খাদ্য দেওয়ার ৫০ সেকেণ্ড পরে খাইতে শুরু করে এবং তাও নিজ হইতে নয়—মুখের মধ্যে খাবার গুঁজিয়া দিতে হয়। এরপর আমরা একবার কি দুইবার কুকুরটিকে খাওয়াই—এবং এইভাবে কুকুরটির মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। নিদ্রাবস্থা অপসারিত করার পর, কুকুরটির পরবর্তী

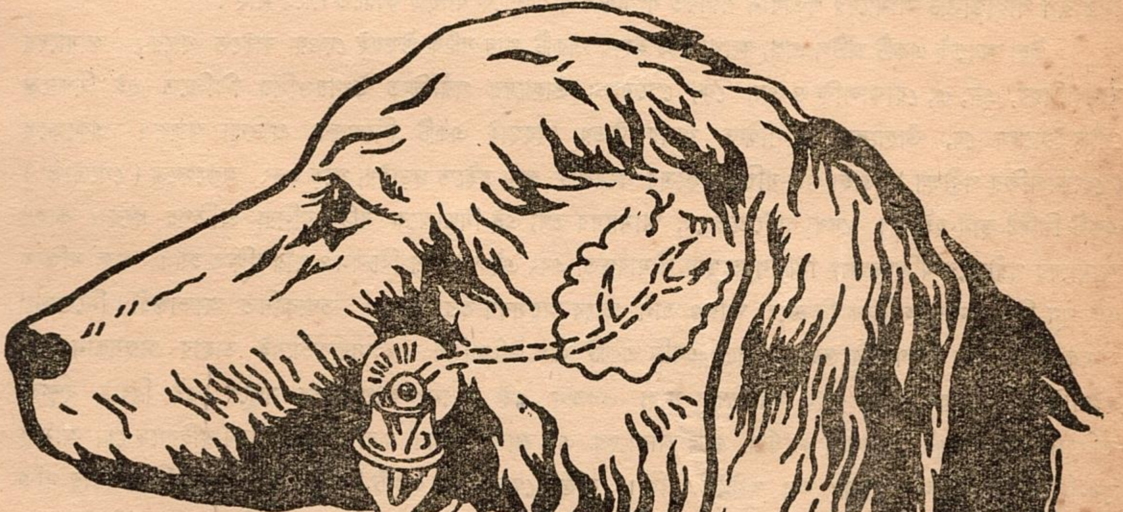

পর্যায়ের লক্ষণগুলি নিম্নরূপ ঃ লালাক্ষরণের পরিমাপ ১০ বিভাগ এবং খাবার দেওয়ার ২২ সেকেণ্ড পর কুকুরটি খায়। যদিও ইহার পূর্বে কুকুরটি ৫০ সেকেণ্ড পর খাইয়াছিল তাও পরীক্ষকের হাত হইতে কিন্তু এখন কুকুর নিজ হইতেই খায় এবং মাত্র ২২ সেকেণ্ডের মধ্যেই খায়। ২০ মিনিট পর আরেক দফা উদ্দীপক ব্যবহার করিলে ক্ষরণের পরিমাপ দাঁড়ায় শূন্য এবং কুকুরটি খাবার দিবামাত্র খাইতে শুরু করে।

পরিশেষে, কুকুরটির উপর যখন পুনরায় সর্তাধীন উদ্দীপক প্রয়োগ করা হয় তখন লালাক্ষরণের পরিমাপ দাঁড়ায় ৩৫ এবং খাবার দিবার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটি খাইতে শুরু করে। এই লক্ষণগুলি পূর্ণ জাগ্রত অবস্থার সূচক। ইহা হইতে আমরা এই স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে, ঘুমাইয়া পড়া এবং ঘুম ভাঙার ধারা আমাদের দুইটি পরাবর্তকেই একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে প্রভাবান্বিত করে। আমাদের এই তথ্য যে শুধু কৌতূহলোদ্দীপক তাই নয়, ইহার একটি কার্য্যকরী মূল্যও রহিয়াছে ; কেন না ইহার ভিতর দিয়া পশুটিকে নিয়ন্ত্রনাধীন রাখা এবং পরীক্ষার পক্ষে বিঘ্নকারী প্রভাবগুলিকে ঠেকাইয়া রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। কুকুরটিকে দুই তিনবার খাওয়াইয়া অথবা পরিবেশের প্রতিক্রিয়া ঠেকাইয়া রাখিয়া অবস্থাকে আমাদের নিয়ন্ত্রনাধীন রাখা অনায়াসেই সম্ভব হইয়াছে। ইহার পর হইতে নিদ্রারূপ পরিস্থিতিটি আমাদের শর্তাধীন পরাবর্ত সম্পর্কিত গবেষণাকে ব্যাহত করিতে পারে নাই।

ইহা অবশ্যই একটি জটিল প্রশ্ন, আপাততঃ ইহার একটি প্রায় সঠিক উত্তরই দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের সহযোগিদ্বয়, এন, এ, রোঝান্সকি ও এম, কে, পেত্রোভা তাঁহাদের পরীক্ষিত উপায়গুলির ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাইয়াছেন যে, তাঁহাদের পরিলক্ষিত ঘুমের উভয় অবস্থাই একটি নিস্তেজক প্রক্রিয়া স্বরূপ। একক্ষেত্রে (রোঝান্সকির পরীক্ষা) তাহা গুরু-মস্তিষ্ক ক্ষেত্রের কয়েকটি স্থান হইতে ছড়াইয়া পড়ে এবং অন্যক্ষেত্রে (পেত্রোভা) একটি নির্দিষ্ট স্থান হইতে। দেখা যাইতেছে যে, আমাদের তথ্য এই সিদ্ধান্তকে সঠিক বলিয়া প্রতিপন্ন করে। কারণ আমাদের পরীক্ষণে মস্তিষ্কক্ষেত্রে নিদ্রালুঅবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং এই অবস্থার বিচলনও পরিলক্ষিত হয়। গুরু মস্তিষ্কে এই ঘুম-নিস্তেজনার গতিকে কিভাবে আরও ভাল ভাবে অনুসরণ করা যায় ? তথাকথিত আভ্যন্তরীণ নিস্তেজনা নামক অপর এক ধরণের নিস্তেজনা সম্পর্কে এমনি একটি প্রশ্ন উঠিয়াছিল এবং সফলভাবেই তাহার অনুসন্ধান করা হইয়াছিল। কয়েক মাস পূর্বে আমাদের মধ্যে একজন এই স্থানে আপনাদের সম্মুখে এই বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই অনুসন্ধান কার্য্যের ফলে আমাদের এই আশা পোষণ করার সঙ্গত কারণ রহিয়াছে যে, আমরা ঘুম-নিস্তেজনা সম্বন্ধেও অনুরূপ ফল পাইতে পারি। মস্তিষ্ক-ক্ষেত্রগুলির একটি নির্দিষ্ট অংশে ঘুম-নিস্তেজনার গতি নিরীক্ষণ করাই সহজতম উপায়। কারণ, সমগ্র ক্ষেত্রের উপর আভ্যন্তরীণ নিস্তেজনার বিচ্ছুরণ সম্পর্কে আমাদের পরীক্ষাসমূহের দ্বারা ইহা দেখা গিয়াছে যে, এক্ষেত্রে এমন কতকগুলি আনুষঙ্গিক অবস্থার অস্তিত্ব পাওয়া যায় যাহা ইহার রূপকে বহুল পরিমাণে জটিল করিয়া ফেলিয়াছে (সম্ভবতঃ ক্ষেত্রগুলির বিভিন্ন অংশের মধ্যবর্তী সীমান্তরেখার স্তরগুলি, উদ্দীপক শক্তির বিভিন্ন ডিগ্রী ইত্যাদি)। আমাদের ল্যাবরেটরিতে এই ধারায় এখন পরীক্ষা করা হইতেছে। মস্তিষ্ক ক্ষেত্রগুলির যে অংশ ত্বকের সহিত সম্পর্কিত সেই অংশেই ঘুম-নিস্তেজনার গতি অনুধাবন করা অধিকতর সুবিধাজনক। তাহা ছাড়া ত্বকের শর্তাধীন উদ্দীপন খুব সহজেই ঘুমেল অবস্থা সৃষ্টি করে। আমরা যদি ধরিয়া লই যে, এই ঘুমেল অবস্থা ঠিক উদ্দীপন-বিন্দুতে সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, এই নিস্তেজন ক্রিয়া কেমন করিয়া এই বিন্দু হইতে মস্তিষ্কের সমগ্র ত্বকীয় অঞ্চলে সম্প্রসারিত হইয়া পড়ে ; এই প্রক্রিয়া কত দূর এবং কত দ্রুত সম্প্রসারিত হয় তাহা নির্দ্ধারণ করা তখনই সম্ভব হইবে। আপাততঃ কিন্তু ইহা শুধুই একটি আশা মাত্র।

অনুবাদক—শ্রীসুনীল সেনগুপ্ত

মানব-মস্তিষ্ক

—সবিতা মুখোপাধ্যায়

সৃষ্টির সবচেয়ে বড় বিস্ময় মানব-মস্তিষ্ক। শুধু তাই নয়; প্রকৃতির জটিলতম আর পূর্ণতম বিকাশ এই মানব-মস্তিষ্ক। মহৎ কল্পনা, দুঃসাহসী কাজ, সুললিত ছন্দ, আর দুরূহতম গাণিতিক ছক—সবই এই মস্তিষ্ক-প্রসূত। পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের পরিলেখ অঙ্কন, ইলেকট্রনিক যন্ত্র, পারমাণবিক-চুল্লী, স্বয়ংক্রিয় সংযোগ-সূত্র—তাও এই মস্তিষ্ক আবিষ্কৃত। মস্তিষ্কের নির্দেশক্রমেই কর্মকুশলী হাত প্রথমে এই নকশাচিত্র কাগজে এবং পরে তা ধাতু ও কাঠে পরিস্ফুটনেও সক্ষম হয়েছে। সফল হয়েছে অন্তরীক্ষ অভিযানে। সবচেয়ে বড় কথা—এই অর্জিত জ্ঞান মানবজাতির কাজে লাগিয়েছে এখানেই তার চরম কৃতিত্ব।

সহস্র বৎসরের সুদীর্ঘ ক্রান্তিপথ পরিক্রমায় মানব মস্তিষ্ক চরম উৎকর্ষ লাভের পথে পার হয়ে এসেছে অবিশ্বাস্য রকমের কত না ক্লান্তিকর কঠোর প্রয়াস। প্রচ্ছন্ন রহস্য আর দুরূহ প্রহেলিকার সহজ সমাধান করতে পারে মস্তিষ্ক। কিন্তু আজও সম্পূর্ণরূপে নিরূপিত হয়নি এই মস্তিষ্কের নিজস্ব নিগূঢ়তম রহস্যময় ক্রিয়াকলাপ।

প্রথম অনুসন্ধানী

ইউরোপীয় নবজাগরণের যুগে শারীরবিদগণ প্রথম শবব্যবচ্ছেদের কাজ শুরু করে করোটির (skull) কঠিন আবরণের নীচে মস্তিষ্কের প্রকৃত রূপ আবিষ্কার করে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে পড়েন। তাঁরা সংযুক্ত অর্ধগোলাকার মস্তিষ্কের ভাঁজ বিশিষ্ট কুঞ্চিত জটিল বিচিত্র গঠনপ্রণালী, পরস্পর বিজড়িত শিরা-উপশিরার নিখুঁত রেখা-চিত্র এঁকে নিতে সফল হন। পরিব্রাজক ও পর্যটকগণ যেভাবে নতুন দেশ আবিষ্কার করে, নতুন নামকরণ করে তার পরিচয় নির্দিষ্ট করেন, তেমনি শারীরবিদগণও মস্তিষ্কের নব আবিষ্কৃত বিভিন্ন ক্ষেত্রের কাব্যময় নামকরণ করেন। যেমন Pons, Varolii, Turkish saddle, Sea horse, Sylvan Viaduct, Field এবং Furrow ইত্যাদি।

কিন্তু তাঁদের কাছে তখনও অজ্ঞাত ছিল যে, আজকের মানুষ মস্তিষ্কের এ আকুঞ্চন ও সংবর্তন, অস্পষ্ট নিঃসীম অতীতের পূর্ববর্তীগণের কাছ হতে উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করেছে। সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর মধ্যে প্রথম মস্তিষ্ক বল্কলের আবির্ভাব হয়। প্রাণী জগতের ক্রম-বিবর্তনের ধারায় প্রতিটি অধ্যায়ে এ বল্কলের আকার ও জটিলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়। শেষ পর্যন্ত করোটিকার (cranium) অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত পরিসরের অভাবে আকুঞ্চিত হয়ে যায়।

তাঁদের মনে এ ধারণার কণামাত্র ছিল না যে এই মস্তিষ্কই হল সব রকম ভাবনা-চিন্তা তথা মননক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল। এতদিন আত্মিক ক্রিয়াকলাপের মর্মকেন্দ্ররূপে আত্মা অর্থাৎ হৃদয়কেই সকলে জানতেন।

অষ্টাদশ শতকের ফরাসী বিজ্ঞানী গল (Gall) করোটির উদ্গত অংশ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সময় এই ধারণায় উপনীত হন যে, এটিই হল আত্মিক শক্তির বহিঃপ্রকাশক। এবং তিনি মানুষের অহঙ্কার, বুদ্ধিমত্তা, শিশুর প্রতি স্নেহ-ভালবাসা ও চৌর্যবৃত্তির উৎপত্তিস্থল মস্তিষ্কের মধ্যে অনুসন্ধান করলেন। গলের আবিষ্কৃত মত বিলাসী অবৈজ্ঞানিকের আসরে উৎসাহের সঙ্গে আলোচিত হল। কিন্তু বিজ্ঞানীকুল এ অভিমতটি সরাসরি বাতিল করে দিলেন। শতবর্ষ আগে সেদিনের প্রখ্যাত ফরাসী শারীরবিদ ও নৃতত্ত্ববিদ পল ব্রোকা (Paul Broca) মানব মস্তিষ্ক নিয়ে বিশেষভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য প্যারিতে 'নৃতত্ত্ববিদ্-সংস্থা' (Society of Anthropologists) গঠন করেন।

মানব মনের শক্তি কতটাএবং নির্ণয়ের উপায় কি ?— এ সমস্যা সমাধানে সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞানীকুল বিচলিত হয়ে পড়েন। গটেনগেনের (Gottengen) পাঁচজন মৃত বৈজ্ঞানিকের মস্তিষ্ক নিয়ে জার্মাণীর গবেষক ভাগনারের (Wagner) গবেষণার ফলাফল তখন প্যারিতে সুবিদিত। ধারণা ছিল বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ মানুষের মস্তিষ্কে পার্থক্য আছে। নিজের মনের পূর্বসংস্কার সত্ত্বেও ভাগনার বিজ্ঞানীর মস্তিষ্কে কোন বিশেষ ব্যতিক্রম দেখতে পান নি। এ অকরুণ সত্য তাঁকে মর্মাহত করেছিল।

মানব-মস্তিষ্কের ওজনের ব্যাপার নিয়েও কম বাদানুবাদের সৃষ্টি হয় নি! ভাগনার তালিকায় প্রথম অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল প্রকৃতিতত্ত্ববিদ কুভেয়ার (Cuvier) ও কবি বায়রনের মস্তিষ্ক। কবি বায়রনের পর, একটি সমগ্র যুগের ধারণাকে প্রভাবিত করেছিল যে মস্তিষ্ক, তা একজন মানসিক রোগগ্রস্ত বৃদ্ধের—যিনি জীবনের অধিকাংশ দিন কাটিয়েছিলেন উন্মাদ আশ্রমে এবং একটি তিন বছরের শিশুর হাইড্রোসেফ্যালিক মস্তিষ্কও কুভেয়ার অপেক্ষা ওজনে ভারী ছিল।

নৃতত্ত্ব সংস্থায় বিজ্ঞানীদের রাতের পর রাত কাটত চরম উত্তেজনায় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে। ব্রোকা এখানে তিনবার বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি ভাগনারের মতবাদ খণ্ডন করে আপন সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করেন। কিন্তু প্রচুর তথ্য থাকা সত্ত্বেও এ থেকে কোন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হল না। দেখা গেল বিভিন্ন মস্তিষ্কের ওজন বিভিন্ন রকমের এবং মানসিকতার সঙ্গে তার কোন যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া গেল না।

সহকর্মীদের প্রচেষ্টাকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারলেন না। শুধু একটি বিষয়ে তাঁরা একমত হলেন যে বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায়ের মস্তিষ্ক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেতেই হবে এবং যত বেশি সম্ভব উপাত্ত (data) সংগ্রহ করতে পারবেন, ততই উপকৃত হবেন।

নৃতত্ত্ব-সংস্থার বিজ্ঞানীরা একটি বিচিত্র চুক্তিতে নিবদ্ধ হন। সংস্থার বিজ্ঞানী-সভ্যরা গবেষণার কাজে আপন আপন মস্তিষ্ক উইল করে দান করে যান। স্থির হয়, যিনি আগে মারা যাবেন, তাঁর মস্তিষ্ক অন্যান্য সহকর্মীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবেন। বিজ্ঞানের সাধনায় তাঁদের এ উৎসর্গ সত্যিই অপূর্ব।

এ চুক্তির পর চিকিৎসক বার্তিলঁ (Bertillon) প্রথমেই মারা যাওয়ায় তাঁর মস্তিষ্ক নিয়ে কাজ শুরু হল। এ সময় সকলে জানতেন, পল ব্রোকা পরীক্ষা করে আবিষ্কার করেছেন, মানুষের ভাষার উৎপত্তি কেন্দ্র হল মস্তিষ্কের অগ্রভাগের আকুঞ্চিত তৃতীয় স্তরে। সকলের ধারণা ছিল যে তাঁদের প্রিয় সুহৃদ সহকর্মী বার্তিলঁর এই বাক্‌কেন্দ্রটি খুবই অপরিণত এবং দুর্বল হবে। কারণ তিনি বক্তা হিসেবে ছিলেন অপটু ও অদক্ষ। কিন্তু তাঁরা সবিস্ময়ে দেখলেন বার্তিলঁর মস্তিষ্কের এই ক্ষেত্রটি খুবই উন্নত। তাঁদের ধারণার সঙ্গে বাস্তবের অমিল ঘটল।

উইলের শর্ত অনুযায়ী একে একে সকল সভ্যদের মস্তিষ্কই প্রয়োগশালায় পরীক্ষিত হল। ব্রোকার মস্তিষ্কও বাদ গেল না।

গবেষণার ফলে মস্তিষ্কের গঠনে নানা বৈচিত্র্য ও পার্থক্য জানা গেলেও, এ থেকে কোন নির্দিষ্ট বিধি প্রণয়ন করা সম্ভব হল না।

অবশেষে বিজ্ঞানীরা তাঁদের এই বহিরঙ্গভিত্তিক মতবাদ বাতিল করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। তাঁরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেন যে মানসিকতা মস্তিষ্কের ওজন ও গঠনের বৈচিত্র্যের ওপর নির্ভরশীল নয়।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য রাশিয়ান বৈজ্ঞানিকগণ পুরোপুরি এই সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেন। ১৮৮৭ সালের রুশ চিকিৎসকদের দ্বিতীয় কংগ্রেসে প্রফেসর জারনভ (D. Zernov) বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিদের মস্তিষ্কের গঠন বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে একটি বিবরণী পেশ করেন।

জারনভ জার্মান বিজ্ঞানী বিশফ (Bischoff)-এর প্রবর্তিত তত্ত্বের তীব্র বিরূপ সমালোচনায় মস্তিষ্কের গঠন-তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করেন। 'জেনারেল এস'-এর মস্তিষ্ক তাঁর পরীক্ষার তালিকাভুক্ত ছিল। সকলে শুনেই বুঝতে পেরেছিলেন যে 'জেনারেল এস' হলেন জেনারেল স্কবেলেভ্ (Skobelev)। জারনভপরীক্ষিত ব্যক্তিদের এক তৃতীয়াংশ উদাহরণ থেকে জানা যায় যে জেনারেল অপেক্ষা সাধারণ সৈনিক ও চাষীদের মস্তিষ্ক ওজনে বেশি। এ সত্য সকলকে মর্মাহত করেছিল। জারনভ জোর দিয়ে বললেন জেনারেলের শিক্ষা ও উদ্যম অবিসংবাদিত রূপে বেশি, এ কথা সত্যি। জেনারেলের মস্তিষ্কে বৈশিষ্ট্যের অভাব দেখিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন যে মানসিক উৎকর্ষ বা বুদ্ধিমত্তা মস্তিষ্কের আয়তনের বা ওজনের ওপর নির্ভর করে না। এ বিষয়ে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে "কোন শিক্ষিত জ্ঞানী ব্যক্তি মানসিকতার উৎকর্ষ নির্দ্ধারণে মস্তিষ্কের ওজনকে মাপকাঠি হিসেবে ভাবতে পারেন না।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রথম অনুসন্ধানীরা ভুল পথে চলেছিলেন। তবু নতুন জ্ঞানপথের পথিকৃৎ হিসেবে তাঁদের অবদান ও প্রচেষ্টার মূল্য অনস্বীকার্য।

বিজ্ঞানী ছাড়াও অন্যান্য জ্ঞানীগুণীরাও মস্তিষ্কের গঠনপ্রণালী ও মানসিক ক্ষমতার পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগসূত্রের সমস্যা নিয়ে আলোচনায় উৎসাহী ছিলেন। সব সময় না হলেও, অনেক সময়ই দেখা যায় কোন বৈজ্ঞানিক বিমূর্ত সমস্যা জীবনের সাধারণ রাজনৈতিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

আজও ঔপনিবেশিকগণ—কফি ও কলা চাষের মালিকগণ, তাঁদের কষাঘাতও শ্রমিকদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহারের সমর্থনে এই খবর প্রচার করে থাকেন যে, আফ্রিকার কালা আদমি ও পশুর মস্তিষ্কে বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। এখনও দাম্ভিক আমেরিকান সেনেটররা—যাঁরা কু-ক্লুক্স-ক্ল্যানের (Ku-Klux-Klan) সমর্থক, প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে প্রকৃতিগত ভাবেই কালো মানুষেব মস্তিষ্ক উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ও রাজনৈতিক কুশলতা প্রমাণে অসমর্থ। ফ্যাসিষ্টরা সদম্ভে প্রচার করেন, আর্য জাতির মস্তিষ্ক অন্যান্য জাতি অপেক্ষা সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ।

'কোস্ট' (Kost) নামক এক ব্যক্তি "অতুলনীয় আর্য মস্তিষ্কের" বিষয়ে লিখ্তে শুরু করেন। এবং "আল্ট্স্কুল" (Altschuhl) নামে এক ব্যক্তি একটি নিগ্রোর মস্তিষ্ক পরীক্ষা করে তার এক ভাঁজে দুটি কোণের অস্তিত্ব থেকে প্রচার করেন নিগ্রোরা "নিম্ন শ্রেণীর জাতি।" আমেরিকান, ব্রিটিশ এবং জার্মান পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে প্রচার করা হয় মঙ্গোলিয়ানদের মস্তিষ্ক "বানরের" (Simian) মতো চন্দ্রাকৃতি ভাঁজ বিশিষ্ট। এই সমস্ত বক্তব্য ফোটো ও দলিল সমেত প্রকাশিত হয়। উদ্দেশ্য—পার তো এ তথ্য অস্বীকার কর।

কিন্তু সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এ দুঃসাধ্য সাধনায় ব্রতী হলেন। তাঁরা সংকল্প করলেন বিভিন্ন মস্তিষ্কের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে কিনা তা তাঁরা নির্ণয় করবেন এবং মস্তিষ্কের গঠনবৈচিত্র্য, কর্মপ্রণালী, সংগঠন ও কার্যকারিতার পারস্পরিক সম্বন্ধ আবিষ্কার করবেন।

জীবন্ত সত্য

উন্নততম মানব-মস্তিষ্ক-বল্কল (cortex) সম-প্রকৃতির নয়। এর মধ্যে কয়েকটি আনুভূমিক স্তর এবং বিশেষ ক্ষেত্র আছে। গবেষকগণ এগুলির গঠনবৈচিত্র্য ও কোষসমষ্টির বন্টন অনুযায়ী দুশোর ওপর ক্ষেত্র সংখ্যাত করেছেন।

গত শতাব্দীর শেষে রুশ বিজ্ঞানী ভ্লাদিমির বেটস্ (Vladimir Bets) স্থির করেন যে মস্তিষ্ক পরীক্ষা করতে হলে আনুভূমিক স্তরের বৈশিষ্ট্যকে পরীক্ষা করতে হবে।

মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের বিশ্লেষক প্রান্তগুলি ছড়িয়ে আছে। এই বিশ্লেষকগুলি হল বিস্ময়কর জীবন্ত প্রক্রিয়া যা বাইরের বস্তুজগতের সমস্ত ছবি এবং শব্দ-বর্ণ-গন্ধ-অনুভূতি আমাদের চেতনার স্তরে পৌঁছে দিচ্ছে। মস্তিষ্কের এই সব বিচিত্র জটিল ক্ষেত্রগুলির মধ্যেই রয়েছে বাক ও লিখন কেন্দ্র এবং সূক্ষ্ম পেশী সঞ্চালনের সমন্বয়-কেন্দ্র। এখনও কিছু কিছু অনধিত "নিশ্চুপ" ক্ষেত্র আছে। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা এই সব ক্ষেত্রের কিছু কিছু স্থানের রহস্য উন্মোচনে সফল হয়েছেন।

বিজ্ঞান-সাধনার পথ কুসুমিত নয়। প্রতিটি আবিস্ক্রিয়া আপাত আকস্মিক মনে হলেও সুদীর্ঘ গবেষণার ফল। কিন্তু তবু মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানের সাধনায় যে শ্রম, ধৈর্য এবং প্রচেষ্টার প্রয়োজন তা বোধ হয় অন্যত্র হয় না।

মস্তিষ্কের আভ্যন্তরীণ গঠন-প্রণালী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য গবেষকগণ মস্তিষ্ককে অদৃশ্যপ্রায় বিশ-পঁচিশ হাজার বিভিন্ন স্তরে কেটে বিভক্ত করেন। বিশেষভাবে প্রস্তুত পরিরঞ্জকে রাঙিয়ে কাঁচের স্লাইডে বড় বড় আধারে এগুলি রাখা হয়। প্রতিটি স্লাইডের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখা হয়। মস্তিষ্ক-কোষগুলিকে অনুবীক্ষণের সাহায্যে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে তাদের বৈশিষ্ট্য ও সংখ্যা নির্ণয় করা হতে থাকে। এত কঠোর পরিশ্রমের পর গবেষক কিন্তু সামান্যমাত্র উপাত্ত সংগ্রহে সক্ষম হন। কেননা তিনি একটি মাত্র মস্তিষ্ক পরীক্ষা করেছেন।

দিন মাস বছর কাটে প্রয়োগশালায়। মস্তিষ্ক-বল্কলের প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের সবিবরণ-ছবি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল। অবশেষে অনেক পরিশ্রমের পর সোভিয়েত একাদামি অফ মেডিকেল সায়েন্সের ব্রেন ইন্‌স্টিটিউটের (Brain Institute of the U.S.S.R. Academy of Medical Sciences) একটি বড় বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী জাতিতত্ত্বের সমর্থক প্রচলিত অবৈজ্ঞানিক ধারণাকে খণ্ডন করার মতো অভ্রান্ত তথ্য প্রমাণ প্রদর্শনে সমর্থ হয়েছেন।

কোন মানুষের—বিশেষ করে একটি সমগ্র জাতির যোগ্যতা, শুধুমাত্র মস্তিষ্কের ছবি থেকে নিরূপণ করা যায় না। ঠিক যেমন দুটি আঙ্গুলের ছাপ বা করতলের রেখা আজ অবধি বিশ্বের কোথাও একরকম দেখা যায়নি, তেমনি দুটি মস্তিষ্কের একই রকম গঠনপ্রণালী কখনও দেখা যায় না। বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্ক-বল্কলের ঘনত্ব নির্ণয়ে, কুঞ্চনের গতি-প্রকৃতিতে, প্রতিটি ক্ষেত্রের অবস্থান ও বিস্তারে, প্রতিটি কোষের গঠনে, সংখ্যাতীত রকমের বৈচিত্র্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত যে স্ত্রী-পুরুষ বা জাতিগত বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব এখানে নেই।

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যে কোন ব্যক্তির মস্তিষ্কে সৃজন-প্রতিভার সম্ভাবনা অভিন্ন। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা পরীক্ষিত এ সত্যটি সপ্রমাণের জন্য কোনও বিশেষ প্রবন্ধের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করেন। দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত আফ্রিকার কালো মানুষের বিপ্লব ও স্বাধীনতা অর্জনের খবর থেকে এবং এই সব নব-স্বাধীনতা-লব্ধ রাষ্ট্রের বীর নেতাদের বক্তৃতা পড়লেই একথার সত্যতা জানা যায়। এযাবৎ পুরনো আমলের বিজ্ঞান প্রচারকরা যাদের "নিম্ন শ্রেণীর জাতি" রূপে আখ্যাত করে এসেছেন, তাদের মধ্যেও কী আমরা অসাধারণ রাজনীতিক প্রতিভা, উচ্চ

ভাবধারা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাচ্ছি না? বর্তমান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এঁরা আজ ইউরোপীয়দের সমশ্রেণীরূপে পরিগণিত। জীবন-ইতিহাস বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

রহস্য উন্মোচনের তোরণ প্রান্তে

রহস্য-সমাকীর্ণ মানব-মস্তিষ্কদুর্গের সঠিক খবর জানার পিছনে রয়েছে বহু শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা; এ প্রচেষ্টার বিভিন্ন অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই বহু আনন্দময় সাফল্য, মর্মান্তিক ব্যর্থতা, অজ্ঞানতা-প্রসূত ভ্রান্তি আর উদ্দেশ্যমূলক সত্যের বিকৃতি।

বানর থেকে নর জীবনে উত্তরণের পথে দৈবশক্তি নিহিত আছে—এই অভিমত ব্যক্ত করার জন্য একদা চার্ল্স ডারউইনের এক প্রিয় শিষ্যের সঙ্গে তাঁর বিবাদ সৃষ্টি হয়।

কিন্তু ডারউইন জানতেন না একশো বছর পরে আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের বক্তৃতামঞ্চ হতে বলা হবে, মস্তিষ্কের বাইরের অদৃশ্য রহস্যময় শক্তি মানুষের আত্মিক কর্মপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ করছে। সম্প্রতি ঠিক এই কথাগুলিই বলেছেন শেরিংটনের ছাত্র খ্যাতনামা ব্রিটিশ শারীরবৃত্তবিদ্ এক্ল্স্ (Eckles)। একদা এই শেরিংটনের ভাববাদের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন অ্যাকাডেমিসিয়ান পাভলভ।

মস্তিষ্ক-বিজ্ঞান আজ ধোঁয়াটে ভাববাদ ও মায়াবাদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল বস্তুবাদ দর্শনের সাহায্যে অভিযান চালিয়েছে। অসীম সাহসে ভীরু অজ্ঞেয়বাদকে অগ্রাহ্য করে বস্তুবাদী দুনিয়ার অস্তিত্বকে স্বীকার করেছে।

"শ্রম ও বাকশক্তি এই দুই উদ্দীপকের প্রভাবে বানর-মস্তিষ্ক ক্রমশঃ মানব-মস্তিষ্কে রূপান্তরিত হয়েছে"—এঙ্গেল্সের এই উক্তি সোভিয়েত একাদামি অফ মেডিকেল সায়েন্সের ব্রেন ইন্স্টিটিউটের বক্তৃতাকক্ষের চারদেয়ালে খোদিত রয়েছে। বিজ্ঞানীদের নিত্য নতুন গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করছে এই আদর্শবাণী।

মানব-মস্তিষ্ক কেবলমাত্র পৃথিবীর সম্পদই সৃষ্টি করেনি। বিশ্বদুনিয়ার বস্তুবাদীরূপ আবিষ্কারের পথে কঠোর জীবন সংগ্রামের মধ্যে ঘটিয়েছে আপনার নিত্য নব-রূপায়ণ।

ক্রমোন্নতির পথে স্নায়ুকোষ—নিউরন এমন দুটি বিশিষ্ট গুণ আয়ত্ত করেছে, যার ফলে অন্যান্য জীবকোষের তুলনায় এক বিশেষ উচ্চস্তরের স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হয়েছে। প্রথম আয়ত্তাধীন গুণ হল স্মরণশক্তি—অর্থাৎ এই কোষের উদ্দীপনা-সঞ্জাত ছাপকে দীর্ঘকাল ধারণ করার ক্ষমতা। এবং স্মৃতির বিষয়বস্তু অন্যান্য কোষ সমূহে প্রবাহিত ও প্রেরণ করার ক্ষমতাটি হল দ্বিতীয় গুণ।

স্নায়ু-কোষগুলি কতকগুলি বিশেষ তন্তুর সাহায্যে পরস্পর সংযুক্ত। একটি দীর্ঘ (axon) এবং অনেকগুলি হ্রস্বতন্তু (dendrites) আছে, যার গায়ে অসংখ্য অতিক্ষুদ্র স্ফীতি দেখতে পাওয়া যায়।

এই সমস্ত কোষ এবং তন্তুগুলির বিন্যাস যে আলাদা—তা' প্রমাণিত। এমনকি, মস্তিষ্ক বল্কলের কোষগুলির গঠন, আকার এবং আয়তনও অসমান। হয়তো এগুলির বিভিন্ন কার্যকারিতা বা বৈশিষ্ট্য আছে। এ নিয়ে বিজ্ঞানীরা আজকাল বিশেষভাবে চিন্তা করছেন।

প্রখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী প্রফেসর এস. সারকিসভ্ (S. Sarkisov) মস্তিষ্ক পরীক্ষা করে এক ধরনের তারকা-আকৃতির কোষ-গুচ্ছের সন্ধান পেয়েছেন এবং তিনি মনে করেন এই কোষগুলিই স্মৃতিসংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় মুখ্য অংশ গ্রহণ করে থাকে।

জীবজন্তুর মধ্যে অনুরূপ কোষের স্বল্পতা ও মানুষের মধ্যে প্রাচুর্য দেখা যায়। বিশেষ ক'রে মানব-মস্তিষ্ক-

বল্কলের উচ্চতর ও নতুনতর স্তরে এদের প্রাচুর্য সমধিক। ক্রমবর্ধমান ভ্রূণে এই কোষগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে ও এরা ক্রমশই জটিল ও সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে। প্রথমে এগুলি ছোট গুণ (×) চিহ্নের মত দেখতে থাকে। তারপর ছোট্ট তারার আকৃতি লাভ করে। পূর্ণপ্রকাশিত কোষগুলিকে দেখ্‌লে তুষারপুঞ্জের রমনীয় বর্ণালীর বহিঃরেখার কথা মনে হয়।

অন্যান্য কোষের অ্যাক্সনগুলি সাধারণতঃ মস্তিষ্ক-বল্কলের গণ্ডি পেরিয়ে ছড়িয়ে থাকে এবং নিম্নমস্তিষ্কের মাধ্যমে পেশীতে উদ্দীপনা সংকেত সঞ্চালিত করে। কিন্তু তারকা-আকৃতি কোষের অ্যাক্সনগুলি মস্তিষ্ক-বল্কলের বাইরে কখনও যায় না। এই কোষগুলি মস্তিষ্কে গৃহীত বিভিন্ন ধারণা বা স্মৃতির ধারক বলেই কী এ বৈশিষ্ট্য? দর্শন-ইন্দ্রিয়ের বিশ্লেষক-কেন্দ্রে তারকা-আকৃতির কোষগুলির সংখ্যাধিক্য লক্ষনীয়। এ থেকে প্রমাণিত হয়—দৃষ্ট ধারণা সহজেই স্মরণ থাকে এবং এর প্রভাবই প্রবল। 'একশোবার শোনার চেয়ে একবার দেখার মূল্য অনেক বেশি'—এই প্রবাদ বাক্যটি এই জন্যই বোধ হয় প্রচলিত।

স্নায়ু-কোষগুলির পারস্পরিক সংযোগ-সূত্র প্রত্যক্ষরূপে জটিল হলেও মানুষের চিন্তাধারার সূত্র সবসময়েই জ্ঞেয় ও বাস্তবানুগ। মানুষের চিন্তার স্বচ্ছতা ও চেতনা, প্রতিটি কোষের অবস্থা ও তার রাসায়নিক প্রক্রিয়া এবং এদের পারস্পরিক সংযোজন ও বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল।

সম্প্রতি সংযোগ সেতুগুলিকে (Synapses) প্রভাবিত করার মতো রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই এই আবিষ্ক্রিয়া মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় যুগান্তর এনেছে। এর প্রয়োগক্ষেত্র খুবই ব্যাপক। এবং এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় ও উজ্জল।

১৪ বিলিয়ন মস্তিষ্ককোষে তাদের তন্তুর দৌলতে সংখ্যাতীত রকমের যোগাগোগ ঘটতে পারে। এর ফলে মানুষের সম্ভাব্য জ্ঞানের পরিধি হয়ে উঠেছে অপরিসীম।

সম্প্রতি ব্রেন ইন্‌স্‌টিটিউটের ইলেকট্রো-ফিজিওলজিকাল প্রয়োগশালায় (Electrophysiological laboratory of the Brain Institute) আপাত সাধারণ কিন্তু প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ একটি পরীক্ষা করা হয়েছে। শব্দ-সংকেতের সঙ্গে বোতাম টিপে একজন মানুষের একটি নতুন পরাবর্ত (reflex) তৈরি করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের জৈব-তরঙ্গ (biocurrent) লিপিবদ্ধ করা হয়। এই সহজ প্রক্রিয়াটি যতক্ষণ না আভ্যাসিক ক্রিয়ায় পরিণত হচ্ছে, ততক্ষণ মস্তিষ্ক-বল্কলের বহু অংশ শব্দ-সংকেতে উদ্দীপ্ত হতে দেখা গেল। কিন্তু যে মুহূর্তে পরাবর্তটি তৈরি হল—তখন মস্তিষ্ক-বল্কলের দুটি মাত্র অংশে—বাচনিক ও সঞ্চালক (oral & motive) অঞ্চলে জৈব তরঙ্গের পরিবর্তন দেখা যায়।

শর্তাধীন পরাবর্তটির বিকাশের পর মস্তিষ্ক-বল্কল নতুন কাজের জন্য মুক্তিলাভ করে। ফলে মস্তিষ্কের ক্ষমতাও বেড়ে যায়। একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জনের ফলে অতি সহজেই সে কাজটি করা সম্ভব হয় এবং মানুষ যত বেশি অধ্যয়ণ করে তত সহজ হয় শেখা।

ক্রিয়া-কর্মের মধ্য দিয়েই মানসিকতার উৎকর্ষ। মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের ইতিহাস—যার অনেকখানি আজ জানা, এ সত্য সপ্রমাণিত করে।

প্রকৃতি গবেষকদের একটি বিশেষ বিধান শিখিয়েছে—মানুষের জরায়ুস্থ বিকাশ প্রজাতির জৈব-বিবর্তনের পুণরাবৃত্তি মাত্র।

প্রথম কয়েক মাস ভ্রূণ-মস্তিষ্ক খুবই মসৃণ থাকে; কেবলমাত্র জৈবপ্রক্রিয়াক্ষম আদিম প্রাণী মস্তিষ্কের মতই।

মানব ভ্রূণ-মস্তিষ্কে প্রথম ভাঁজের আবির্ভাব হয় ছ'মাসে—লক্ষ লক্ষ বছর আগে প্রাণী জগতে যেমনটি ঘটেছিল। মস্তিষ্কবল্কলের ওপরের স্তর ভ্রূণ জীবনের পাঁচ হতে দশ মাসের মধ্যে তিরিশগুণ বেড়ে যায়।

তারপর, শিশু যখন ক্রমশঃ হাঁটতে, কথা বলতে ও নানা জিনিষের ব্যবহার শেখে—মস্তিষ্কবল্কল আরও দক্ষতা ও সম্পূর্ণতা লাভ করে। মানবজীবনের সূচনায় যা ঘটেছিল এ যেন তারই পুনরাবৃত্তি। ক্রিয়াকর্ম, প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়, সঙ্গলিপ্সা—স্নায়ু-সংস্থাকে ক্রমশঃ আরও সংস্কৃত ও জটিল করে তুলেছে।

এ অসামান্য প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটেছে কী? না। আগামী দিনের বিজ্ঞানীরা বলবেন, কমিউনিজমের যুগ—মহত্তম কর্ম-সংসাধনের যুগ—মানব মাস্তিষ্কে নতুন এবং উচ্চতর গুণরাজি সন্নিবিষ্ট করেছে।

যদিও মস্তিষ্ক সম্পর্কীয় পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান এখনও আমরা অর্জন করিনি, তবে বড় কথা এই যে বিজ্ঞান আজ মস্তিষ্কের গোপনীয় কার্যক্রমের সন্ধান পেয়েছে; এবং প্রকৃতির গভীরতম রহস্য উন্মোচনের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত।

জি. অরলোভার একটি প্রবন্ধের ভাবানুলেখন
—সবিতা মুখোপাধ্যায়

পর্দার উপর মস্তিষ্কের জৈববিদ্যুৎ প্রবাহের ছবি

কয়েক বছর আগে সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক এম, এন, লিভানভ ইঞ্জিনীয়ার ডি, এম, আনানিয়েভের সহযোগিতায় বেশ একটি চমকপ্রদ রকমের যন্ত্র তৈরি করেছেন। ব্রুশেলস বিশ্বমেলায় এই যন্ত্রটিকে দেখানো হলে এর উদ্ভাবনের জন্য উদ্ভাবককে স্বর্ণপদকে সম্মানিত করা হয়। যন্ত্রটির নাম ইলেক্‌ট্রো এনসেফালোস্কোপ। এই যন্ত্রটি আবিষ্কারের ফলে মানুষের উচ্চতর স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপের উপর গবেষণার সম্ভাবনা যথেষ্ট রকম বেড়ে গেছে। শুধু গবেষণার ক্ষেত্রেই নয় এর গুরুত্ব বর্তমানে আরো বেশি বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। পলেনভ ইনস্টিটিউট অব নিউরোসার্জারী, সেন্ট্রাল এডভান্সড মেডিকেল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের মানসিক রোগীদের হাসপাতালে এবং মস্কো ও লেনিনগ্রাদের অন্যান্য কয়েকটি চিকিৎসা কেন্দ্রেও ইতিমধ্যেই এই যন্ত্রটি রোগনির্ণয়ের কাজে লাগানো হয়েছে।

সেন্ট্রাল এডভান্সড মেডিকেল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের মানসিক ব্যাধির হাসপাতালের একটি ল্যাবরেটরীতে পাশাপাশি আছে দুটি যন্ত্র। এর একটি এই ইলেক্‌ট্রো এনসেফালোস্কোপ ও অপরটি এনসেফালোগ্রাম। এনসেফালোগ্রাম সম্পর্কে হয়তো আগে থেকেই অনেকের ধারণা আছে, কারণ অনেকদিন ধরেই এই যন্ত্র পৃথিবীর প্রায় সব জায়গায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু বলাবাহুল্য ইলেক্‌ট্রো এনসেফালোস্কোপের এরকম মডেল এই প্রথম।

মানব মস্তিষ্কের জৈব বিদ্যুৎপ্রবাহ গ্রহণ করার মতো প্রচলিত যত যন্ত্র আছে তাদের সঙ্গে এই ইলেক্‌ট্রো এনসেফালোস্কোপের তফাত এই যে, এর সাহায্যে মস্তিষ্কের বিদ্যুৎপ্রবাহের বিস্তৃতির তারতম্য সোজাসুজি প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া যায়। তবে যাঁরা জানেন না, তাঁদের কাছে এই দুই যন্ত্রের বাইরে চেহারার তফাত শুধু এই যে, এনসেফালোগ্রাফের সঙ্গে একটি চওড়া টেপ-রেকর্ডার আছে—যার উপর মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের জৈববিদ্যুৎ প্রবাহের অর্থজ্ঞাপক বক্ররেখা চিহ্নিত হয়। কিন্তু এনসেফালোস্কোপের সে রকম কিছু নেই। তার বদলে আছে একটি টেলিভিশানের পর্দা। এই পর্দায় মস্তিষ্কের জৈববিদুৎ প্রবাহের যে প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় তা আরও বেশী স্পষ্ট এবং বলা যেতে পারে গতিশীল।

পর্দ্দার উপর ফুটে ওঠে নীলাভ কয়েকটি উল্লম্ব রেখা আর তার উপর কয়েক সারি উজ্জ্বল আলোক বিন্দু। পর্দ্দার উপর নজর রাখলেই মস্তিষ্কের ভিতরকার ক্রিয়া কলাপ বোঝা যাবে। আলাদা ভাবে কোনও রকম সঙ্কেতোদ্ধারের প্রয়োজন হবে না। এনসেফালোগ্রাম মস্তিষ্কের মাত্র কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশের জৈব বিদ্যুৎপ্রবাহ ধরতে পারে। আসলে এতে ১৬ থেকে ২০টি বিন্দুর বেশী ধরা যায় না। অপরদিকে এনসেফালোস্কোপে-এ পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র অনেক বেশী প্রসারিত। ব্রুশেলস্ বিশ্বমেলায় যে যন্ত্রটি দেখানে হয়েছিলো, তার মধ্যে উচ্চ মস্তিষ্কের ৫০টি বিন্দুর নির্দ্দেশ পাওয়া যেত। কিন্তু তারই একটি উন্নততর সংস্করণ আছে সোভিয়েট বিজ্ঞান মন্দিরের উচ্চ স্নায়বিক ক্রিয়া সম্পর্কীয় গবেষণাগারে। এই যন্ত্রটিতে ১০০টি বিন্দু পর্যবেক্ষণ করা যায়। এই দিক থেকে এর উন্নতি সাধনের সম্ভাবনা

অপরিসীম। কারণ এই যন্ত্রটি ইলেক্‌ট্রোনিক অঙ্কের সুত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ এর সাহায্যে কালক্রমে সমগ্র মস্তিষ্কের জৈববৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সম্ভব হবে।

ল্যাবরেটরীর রিসার্চ কর্ম্মী নিনা গাভরিলোভার কাছ থেকে জানা যায় যে পর্দ্দার উপর যে আলোগুলি জ্বলে ওঠে তার ধাঁচটি খুব সরল। রুগীকে একটী বিশেষ ধরনের টুপি পরানো হয় যাতে কতকগুলি ছিদ্র করা আছে এবং সেই ছিদ্রগুলির মধ্যে বসানো আছে ৫০টি ইলেক্‌ট্রোড। পর্দ্দার উপর জ্বলে ওঠা ৫০টী প্রোজ্জ্বল আলোকবিন্দু—ঐ ৫০টি ইলেকট্রোডর পরিজ্ঞাপক। প্রত্যেকটি ইলেক্‌ট্রোডের একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা দেওয়া আছে এবং এক একটি সংখ্যা মস্তিষ্কবল্কলের (Cortex) এক একটি স্থানের নির্দ্দেশক।

আলোকবিন্দু গুলি সদাচঞ্চল। কখনও উজ্জ্বল কখনও নিষ্প্রভ। পরীক্ষক এই বিন্দুগুলির অবস্থিতি থেকে বুঝতে পারেন রুগীর মস্তিষ্কের কোন কোন জায়গার জৈববৈদ্যুতিক ক্রিয়া স্বাভাবিক বা উদ্দীপিত অথবা নিস্তেজিত। এই আলোকবিন্দু গুলির নীচেই কতকগুলি উল্লম্ব রেখা থেকে নীলাভ আলোক শিখা বিচ্ছুরিত হয়। সংখ্যাযুক্ত পাঁচ সারি আলোক বিন্দুর অনুরূপক এই রেখাগুলি পাঁচভাগে ভাগ করা। কোনও কোনও সময় এই আলোকরেখাগুলি অত্যন্ত স্তিমিত হয়ে পড়তে পারে। এরকম হয় নিদ্রাবস্থায় অথবা যখন মস্তিষ্ক তন্দ্রাচ্ছন্ন বা নিরুদ্দীপিত অবস্থায় থাকে। কিন্তু এতো হলো শুধু সুস্থ মস্তিষ্কের বেলায়। অসুস্থ অবস্থায় কি হয়? সাধারণতঃ মানসিক ব্যাধির হাসপাতালে অসুস্থ লোকদেরই পরীক্ষা করা হয়। মস্তিষ্কের অসুস্থ নিস্তেজনার একটি দৃষ্টান্ত সিজোফ্রেনিয়া। বিশেষ অবস্থায় সিজোফ্রেনিয়া রোগীকে মনে হয় অর্ধনিদ্রিত। যদিও সে তখনও সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত। কার্য্যত সে নিশ্চল ; মনে হয় যেন বাইরের কোনও কিছুতেই সে সাড়া দিচ্ছে না। এমন কি চিন্তা পর্যন্তও করছে না।

অন্য একটি রোগ ধরা যাক, যেমন মৃগী রোগ (Epilepsy)। এনসেফালোস্কোপের টুপিটি রোগীকে পরানো হলে এ রোগের বেলায় একেবারে আলাদা ছবি দেখা যাবে। হ্রস্ব আলোক-শিখাগুলি হয়ে উঠবে সচল ; লক্‌লকে অগ্নি-জিহ্বার মত দেখাবে। লাফ দিয়ে তৃতীয় সারির বিন্দু চিহ্নগুলিকে স্পর্শ করবে এবং তৃতীয় সারির বিন্দুগুলিও সঙ্গে-সঙ্গে জ্বলে উঠবে তীব্রভাবে। এই তৃতীয় সারির বিন্দুগুলো মস্তিষ্কের পেশী সঞ্চালক অঞ্চলের নির্দেশক। এটা খুবই খারাপ অবস্থা। এর থেকে বোঝা যাবে রোগী ভয়ানক রকম উত্তেজিত অবস্থায় আছে। এটা রোগীর আসন্ন মূর্ছার নিশ্চিত লক্ষণ।

এতদিন পর্যন্ত ধারণা ছিলো মৃগীরোগীর মূর্ছা হঠাৎই হয়, কবে কখন হবে আগে থেকে তা অনুমান করা কখনোই সম্ভব নয়। কিন্তু এনসেফালোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে এখন আসন্ন মূর্ছার ভবিষ্যৎবাণী করা খুবই সহজ হয়ে পড়েছে। কার্যকারিতার দিক থেকে এর তাৎপর্য অসীম। চিকিৎসক যদি আগে থেকে জানতে পারেন—কয়েক দিনের মধ্যেই রোগীর মূর্ছার সম্ভাবনা—তবে সহজেই তার প্রতিষেধক কোনো ব্যবস্থাবলম্বন করতে পারেন, অন্ততপক্ষে তার তীব্রতা হ্রাস করা খুবই সম্ভব। মৃগীরোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই যন্ত্রের গুরুত্বের এইটাই অবশ্য সবদিক নয়। অতিমাত্রার সাংকেতিক চিহ্নের প্রয়োগ ও তার অর্থোদ্ধার ছাড়াই যদি মস্তিষ্কের সমগ্র ক্রিয়াকলাপ নিরীক্ষণ করা সম্ভব হয় তবে রোগগ্রস্ত জায়গাগুলিকে বের করাই শুধু নয়, সেগুলিকে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে বাদ দেওয়াও সহজতর হয়ে ওঠে। এইভাবে এনসেফালোস্কোপ পদ্ধতির সাহায্যে অস্ত্রোপচারের দ্বারা মৃগীরোগীর চিকিৎসা অনেক বেশি নির্ভর-যোগ্য। এর মধ্যে এই ধরনের সুক্ষ্ম অস্ত্রোপচার করাও হয়েছে। এবং ফলও পাওয়া গেছে চমকপ্রদ।

আর একটি ব্যাধি আছে—যার চিকিৎসায় রোগী এবং চিকিৎসক উভয়ের নিকটই এনসেফালোস্কোপের মূল্য অপরিমেয়। এ হলো মস্তিষ্কের অর্ব্বুদ (Tumour)। এই রোগ নির্ণয় করা এতাবৎকাল ছিলো নিতান্তই দুঃসাধ্য ও অতীব যন্ত্রনাদায়ক। এখন এনসেফালোস্কোপ পদ্ধতির সাহায্যে মস্তিষ্কের অর্ব্বুদ ঠিক কোনখানটিতে হয়েছে তা বের

করা সহজেই সম্ভব হয়েছে। এবং এতে রোগীরও কোনো কষ্ট হয় না। পর্দ্দায় এই টিউমার ধরা পড়বে আলোকিত বিন্দুগুলির সঙ্গে তুলনায় কৃষ্ণবর্ণ বা অন্ধকার এক বিন্দুরূপে—অর্থাৎ এটি ঐ মস্তিষ্কের "নিশ্চ্ প ক্ষেত্র"।

এখন আর একটি কথা। একটি টেলিভিশন পর্দায় মস্তিষ্কের জৈববৈদ্যুতিক ক্রিয়ার গতিশীল ছবি দেখা যায়। সুইচ বন্ধ করলে কি এই ছবি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ? মাত্র একবার চোখে দেখেই কি একটা সিদ্ধান্ত করে নিতে হবে ? সর্ব্বোপরি তা করতে হবে এমন এক অবস্থায় যখন অস্ত্রোপচারের প্রশ্ন রয়েছে—প্রশ্ন রয়েছে অর্ব্ব্ুদের সীমানা নির্ধারণ অথবা মৃগীরোগের উৎসক্ষেত্র বের করার ? যা অস্ত্রোপচারের সাহায্যে অপসারণ করতে হবে। বিন্দু এবং রেখাগুলোর অবিরাম জোরালো আলোয় চোখ খুব শীঘ্র শ্রান্ত হয়ে পড়ে। এই সমস্যার সমাধান কী ?…এই ব্যাপারটীকে মনে রেখে পর্দাটি একটি চলচ্চিত্র ক্যামেরার সামনে রাখা হয়েছে এবং যা কিছু দেখা যায় তার চলচ্চিত্র তুলে নেওয়া হয়।

এনসেফালোস্কোপ পদ্ধতির ভবিষ্যৎ কী ? অদূর ভবিষ্যতেই এর সাহায্যে নিরীক্ষণের এলাকা কয়েক শত বিন্দু থেকে গোটা মস্তিষ্কের প্রতিটি ক্ষেত্রের প্রতিটি বিন্দুতে বিস্তৃত হয়ে পড়বে। আর এখনো পর্যন্ত যা সম্ভব হয়নি—মস্তিষ্কের কোনো অংশকেই বাদ না দিয়ে মস্তিষ্কক্রিয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষণ ও পরীক্ষাকার্য সম্ভবপর হয়ে উঠবে।

[ই, দশকাচের একটি প্রবন্ধের মর্মানুবাদ করেছেন সমর গুপ্ত]

মানুষ ও স্বয়ংচালিত মেশিন

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

মহাকাশচারী হের্মান টিটফ সম্পর্কে সোভিয়েত মহাশূন্যপোতাশ্রয়ের দপ্তরে একখানি খাতায় লেখা আছে ঃ—

"বয়েস ২৬, লম্বা ১৬৬ সেন্টিমিটার, ওজন ৬১ কিলোগ্রাম, ফুসফুসের ক্ষমতা ৪৫০০ ঘন সেন্টিমিটার। স্বভাব, ধীর, স্থির, মননশীল, লৌহ স্নায়ু শক্তি……"

মহাশূন্যপোত ভস্তকের সব কিছুই ছিল স্বয়ংবহ ও স্বয়ংচালিত কিন্তু তবু টিটফ বা গাগারিনের মত সুস্থমনা ও স্বাস্থ্যবান মানুষ সেই স্বয়ংচালিত জাহাজ পরিচালনা করেছেন এবং মহাকাশ পরিক্রমা সংক্রান্ত বহু মূল্যবান তথ্য ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন যেগুলি পরিচালকবিহীন অবস্থায় উড়লে ভস্তকের কোন স্বয়ংক্রিয় কল কৌশলের পক্ষেই সম্ভব হোতনা। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর জমিতে বসে বৈজ্ঞানিকরা মহাকাশে ভস্তকের গতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। যন্ত্র যতই শক্তিশালী বা স্বয়ংক্রিয় বা 'বুদ্ধিমান' হোক, তার স্রষ্টা মানুষই তার মালিক ও পরিচালক। মানুষের বুদ্ধি ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের 'বুদ্ধির' মধ্যে বাহ্যিক কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকলেও মানুষের বুদ্ধি অনেক বেশি উঁচু স্তরের ও দরের। স্বয়ংক্রিয় 'বুদ্ধিমান' যন্ত্রগুলি মানব মস্তিষ্কের পরিবর্দ্ধন, যেমন পরিবর্দ্ধন হচ্ছে হাতুড়ি, মানুষের হাতের। হাত ও হাতুড়ি কেউই ফেলনা নয়, একে অপরের সহায়ক।

আজকের যুগে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র কৌশল ছাড়া মানুষের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব নয়। আধুনিক যন্ত্রনিয়ন্ত্রণ কৌশলের সাহায্য না পেলে জটিল উৎপাদন ব্যবস্থার (কারখানা শিল্পের) বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা যাবে না। এবং বাইরে থেকে আসা বিভিন্ন সংকেতে তাড়াতাড়ি ও নির্ভুলভাবে সাড়া দেওয়াও যাবে না। মানুষের মন, আশংকা, অনিশ্চয়তা, অবসাদ, বিরক্তি, ক্লান্তি ইত্যাদি হরেক রকমের ব্যাপারের আওতায় থাকে যেগুলির প্রভাব কাজের প্রতিকূল এবং ঠিক ব্রাহ্ম মুহূর্তে সেগুলি মানুষকে অবসন্ন করে ফেলতে এমন কি কাজের বার করে দিতে পারে। এই জন্যেই মানুষের মত স্থির করতে দেরি হয়, সে দোমনা হয়, ভুল করে—যার ফলে তার কাজের অবনতি ও গলতি থেকে যে কোন যান্ত্রিক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

যন্ত্রের কিন্তু এই সব দুর্বলতা নেই। সে কোন্ অবস্থাতেই ভয় পায় না বা 'ক্লান্ত' হয়ে পড়ে না। যন্ত্র প্রচণ্ড শক্তি ও বেগের অধিকারী হতে পারে এবং মানুষের চেয়ে অনেক বেশি তথ্য স্মরণ রেখে সেগুলি কাজে লাগাতে পারে। শুধু তাই নয়, দশমিক সূত্রে সাজিয়ে দিলে যন্ত্র যে কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে। এমনকি জটিল মাথা ঘামানোর কাজ পর্যন্ত তার সামর্থ্যের বাইরে নয় এবং সে কাজ সে যে কোন মানুষের চেয়ে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি ও নিখুঁত ভাবে করবে।

"চিন্তাশীল" পরিগণনা যন্ত্রের উদ্ভব হওয়ার ফলে প্রধানত যা ঘটেছে তা হচ্ছে উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে মানুষ ও মেশিনের দায়িত্বের নতুন ভাবে ভাগাভাগি।

এই সেদিন পর্যন্ত যন্ত্রকে প্রধানত দায়িত্ব দেওয়া হোত যে কোন কাজ করে দেওয়ার। নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের ভার মানুষ যন্ত্রকে না দিয়ে নিজের হাতে রেখেছিল। আজ যন্ত্র কৌশল যে স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে মানুষ নিজেই স্বয়ং চালিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থারই একটি উপাদান বা অংশ হয়ে দাঁড়াবে কারণ এমন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র আজ তৈরি হবে যা স্বয়ংক্রিয় কৌশলে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের কাজ নিয়ন্ত্রিত করে।

কিন্তু তাই বলে একথা মনে করা ভুল হবে যে আজকের যুগে মানুষ আর মেশিনে কোন পার্থক্য নেই। এই ধরনের ধারণা যন্ত্রের ওপর নরত্ব আরোপ করার সামিল। যন্ত্র যদি মানুষের সমকক্ষ হোত তাহলে শুধু পরিগণনা করা অংক কষা কেন, সে গণিতের বিভিন্ন সমস্যা ও সূত্র নিজেই সৃষ্টি করতে পারত, শুধু তর্জমা (ভাষান্তরণ) করা কেন, গল্প ও কবিতা রচনা করতে পারত। যন্ত্রের ওপর যেমন নরত্ব আরোপ করা যায় না, তেমনি আবার মানুষের ওপরেও যন্ত্রত্ব আরোপ করা যায় না।

যন্ত্রের যেমন মানুষের চেয়ে কোন কোন ক্ষমতা বেশি আছে, তেমনি তার আবার অক্ষমতাও আছে। যন্ত্র মানুষের হুকুম তামিল করে মাত্র। মানুষ যে নিয়ম বেঁধে দেয় তার বাইরে এক পাও চলবার ক্ষমতা যন্ত্রের নেই। যে সমস্ত সম্ভাব্য অবস্থার কথা বিবেচনা করে মানুষ যন্ত্রের কাজ ঠিক করে দেয় সেগুলির ক্ষেত্রে যন্ত্র নির্ভুল ভাবে সাড়া দেয় ও আচরণ করে কিন্তু কোন নতুন অপ্রত্যাশিত অবস্থার উদ্ভব হলে যন্ত্র একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে। তখন তার মাথা কোন কাজেই লাগে না কারণ নিজে মাথা খাটাবার যোগ্যতা তার নেই। তখন মানুষের হস্তক্ষেপ করা ছাড়া উপায় থাকে না। ঠিক এই কারণেই মহাশূন্যের রহস্য উদ্ধারের অভিযানে শুধু স্বয়ংচালিত মহাশূণ্যপোত বা তার স্বয়ংক্রিয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি যথেষ্ট নয়। মানুষ স্বয়ং মহাকাশের সরজমিনে গিয়ে তদন্ত না করলে সব রহস্য উদ্ঘাটিত হবে না এবং কত শত সহস্র অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত মহাজাগতিক ব্যাপার সম্পর্কে কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যাবে না, কোন সিদ্ধান্তও করা যাবে না। যন্ত্রের সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা নেই। আছে শুধু মানুষের সিদ্ধান্ত পালন করার যোগ্যতা। তাই মহাশূণ্যের বৈমানিক হের্মান টিটফ বলেছেন, "আমার জাহাজের ওপর আমার ষোল আনা কর্তৃত্ব ছিল। তাকে আমি যখন যেমন খুশি চালাতে পারতাম, যেখানে খুশি নামিয়ে আনতে পারতাম।"

মানুষের সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষ ও সংশ্লেষ করার ক্ষমতা আছে। যে কারণে পরিবেশের কোন পরিবর্তন হলে সে সেটা উপলব্ধি করতে পারে। তার স্নায়ু কেন্দ্রে ক্রমাগত যে সমস্ত উত্তেজক প্রবাহিত হয় সেগুলি বাছ বিচার করে সে, যে সময়ে যে উত্তেজকটি জরুরী সেটি আলাদা করে নেয়। ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে যে সব কারণজ বা সাপেক্ষ স্নায়ু-সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেগুলি এবং তার সহজাত স্নায়ুতন্ত্র তার আচরণের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে প্রতিটি সংকেতে ঠিকমত সাড়া দিতে তালিম দেয়। তার জীবনের বা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত সংকেতগুলির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া যে ভাবে সে প্রকাশ করে তা এক অত্যন্ত পরিমার্জিত ও নিখুঁত স্বয়ংক্রিয় ব্যাপার।

যন্ত্রের তুলনায় মানুষের স্বাভাবিক যোগাযোগ ধারার বেগ কম কিন্তু তার তথ্য বিশ্লেষণ করার মানবীয় বৃত্তি সেই দুর্বলতার ক্ষতি পূরণ করে। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে তার পক্ষে একটা সাধারণ ধারণা করে নেবার জন্যে আগাগোড়া সমস্ত সংকেত বিশ্লেষণ করে দেখবার দরকার হয় না। যেমন ধরুন বই এর পাতা খুলে আমরা কি পড়ার সময় প্রত্যেকটি অক্ষর পড়ি? পড়ি না। সাধারণত আমাদের চোখ চতুর্থ বা ষষ্ঠ অক্ষরটি দেখে শব্দটির

অর্থ ধরে নিতে পারে। শুধু তাই নয়; দেখা গিয়েছে যে মানুষের চোখ অক্ষরগুলির শুধু উপরের অংশটি দেখেই শব্দটি বুঝতে পারে, তলা পর্যন্ত দেখার দরকার হয় না। এই একই কল্পনা শক্তির জোরে মানুষ, কোন যন্ত্রের রেখা দিয়ে আঁকা নক্সা থেকে যন্ত্রটিকে এক ত্রিমানসম্পন্ন বস্তু বলে কল্পনা করতে পারে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের হাতে গড়া ইলেক্‌ট্রনিক পরিগণনা যন্ত্রের গুণগত পার্থক্যের মূলে রয়েছে মানুষের উচ্চতর স্নায়ুকেন্দ্রের সংগঠন ও ক্রমবিকাশের অনন্যতা, বিশেষ করে মানুষের অগ্রমস্তিষ্কবল্কলের অনন্যতা। আধুনিক পরিগণনা যন্ত্রে হাজার কতকের বেশি ইলেকট্রনিক কোষ থাকে না। কিন্তু মানব মস্তিষ্কে নিউরনের সংখ্যা $১০^{১০}$। প্রতিটি নিউরন থেকে ১০ ওয়াট পর্যন্ত শক্তি কাজে ব্যবহার হয়। ইলেকট্রনিক ভাল্‌ভের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ১ ওয়াটের বেশি নয়। যন্ত্রের ইলেকট্রনিক ভাল্‌ভের তুলনায় নিউরন কাজ করে $১০^{৪}$ থেকে $১০^{৫}$ গুণ ধীরে। কিন্তু স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রবিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জন ফন নিউম্যানের মতে "মানব মস্তিষ্কের কাজ অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। মস্তিষ্কের ভাষা গণিতের ভাষা নয়।" আমেরিকার প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ভান্নেভার বুশ এ বিষয়ে বলেছেন :—

"মানব মস্তিষ্ক এক বিস্ময়কর কৌশল। স্মরণশক্তি ও কাজ করার ক্ষমতার দিক থেকে যন্ত্রের শ্রেয়ত্ব বেশী হলেও সূক্ষ্মতা ও নমনীয়তার দিক থেকে যন্ত্র মস্তিষ্কের ধারে কাছে দাঁড়াতে পারেনা এবং অন্তত আমাদের জীবদ্দশায় কোনদিনই পারবেনা।"

যে কোন স্বয়ংচালিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দুটি উপব্যবস্থা নিয়ে গঠিত :—মানুষ ও মেশিন। এই দুটি উপব্যবস্থার মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও প্রত্যেকের নিজস্ব চরিত্র বৈশিষ্ট্য আছে, আছে নিজস্ব কাজের নিয়ম কানুন, আছে নিজস্ব দোষগুণ। এদের কেউই ফেল্‌না নয়, কাউকেই বাদ দেওয়া চলেনা বা এক জনের জায়গায় আর একজনকে বসানো যায়না। দুজনকে এক সঙ্গে মিলিয়ে কাজ করা চাই।

স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় মানব মনস্তত্ত্বের ভূমিকা উপেক্ষা করলে, যন্ত্রের কাজে ত্রুটি হবে এবং উৎপাদনের ক্ষতি হবে। তাই কাউকে এইরকম কোন যন্ত্র ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব দেবার সময় তার মানসিক ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি সমীক্ষা করা উচিত। যেমন বলা যায় যে, মানুষকে অত্যধিক খাটানো উচিত নয় কারণ তার কর্মোদ্যম সংরক্ষিত করা না হলে শ্রমের যুক্তিসঙ্গত সংগঠনে বাধা পড়ে। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে বাইরে থেকে কাজটা 'সহজ' মনে হলেও তাতে প্রচণ্ড স্নায়বিক শক্তি খরচ করতে হয়। যেমন বলা যায়, কোন একটি বৈদ্যুতিক স্টেশনের স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যে লোকটি চুপ চাপ বসে খালি নজর রাখে কাজ ঠিক মত চলছে কিনা, তার মানসিক মেহনত অত্যন্ত ক্লান্তিজনক অথচ বাইরে থেকে দেখে মনে হবে তার কোন কাজই নেই। সোভিয়েত বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর শ্রমিক মনস্তত্ত্বের পরীক্ষাগারে গবেষণার ফলে জানা গিয়েছে যে স্বয়ংক্রিয় কন্‌ভেয়ার বেল্টের কাজ বহুদিন ধরে তদারক করতে করতে শ্রমিকের স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকলাপের ধারা পর্যন্ত বদলে যায়।

যে কোন শ্রমিকের কর্মক্ষমতার একটা সীমা আছে যার দরুন সময়ের প্রতি এককে সে নির্দিষ্ট পরিমাণ তথ্য গ্রহণ ক'রে বিশ্লেষণ করতে পারে। তার যা হজম করার ক্ষমতা তার চেয়ে বেশী খাবার তাকে দিলে তার বদহজম হতে বাধ্য। তার পর কোন্ ধরনের তথ্য বা সংকেত নিয়ে তাকে কাজ করতে হবে সেটাও দেখতে হবে, আরো দেখতে হবে কাজবিশেষের বেগ, কারণ যে ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংকেতের ফাঁকে ফাঁকে বিরাম এক সেকেণ্ডের হাজার হাজার ভাগ সেক্ষেত্রে সংকেতের ধরণ ও বেগের উপর মানব মস্তিষ্কের সাড়া দেওয়ার

সময় নির্ভর করে। সেই সময়ের মোটামুটি মান এই রকম :—

দর্শনেন্দ্রিয়ের	উত্তেজকের	ক্ষেত্রে	—১৫০—২২৫	মিলি সেকেণ্ড
শ্রবণেন্দ্রিয়ের	,,	,,	—১২০—১৮২	,,
স্পর্শেন্দ্রিয়ের	,,	,,	—১১৭—১৮২	,,
তাপীয়	,,	,,	—১৫০—২৪০	,,
বেদনা	,,	,,	—৪০০—১০০০	,,

সুতরাং শ্রমিকবিশেষের নিজস্ব গুণাগুণ, ক্ষমতা অক্ষমতা বিচার না করে এবং যে যন্ত্র নিয়ে সে কাজ করবে সেটি কর্মীর কোন্ ইন্দ্রিয়কে বেশী খাটাবে এসব বিচার না করে কাজ করলে নানারকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এই সব ব্যক্তিগত কারণেই বিমান চালনার ক্ষেত্রে শতকরা ৪০-৪৬টি দুর্ঘটনা ঘটে।

মানুষের এই ধরনের গুণাগুণগত বিশেষত্ব গুলিকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায় :— (১) শরীরসংস্থানিক ও মনস্তাত্ত্বিক (অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্রের জন্মগত বৈশিষ্ট্য) যথা স্নায়বিক কার্য্যকলাপের সমতা ও জঙ্গমতা, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির তীক্ষ্ণতা ইত্যাদি। (২) মনের সচলতা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষত্ব যেগুলি হচ্ছে মানুষের নিজের মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে নৈপুণ্যের সঙ্গে পরিচালনা করার ক্ষমতা, পেশী শক্তি, দূরদর্শিতা, কল্পনাশক্তি ইত্যাদি। (৩) চরিত্রগত বিশেষত্ব যেমন, অধ্যবসায়, কর্মপ্রিয়তা, কর্ত্তব্যপরায়নতা ইত্যাদি।

আফশোষের কথা এই যে ব্যক্তিবিশেষের এই সমস্ত গুণাগুণ বিচার বিশ্লেষণ থেকে যে সব তথ্য আমরা আজ পর্য্যন্ত পেয়েছি সেগুলির নির্ভরযোগ্যতা ও পরীক্ষিত ব্যাপারগুলির তুল্য মুল্য বিচার করলে বলা যায়, তাদের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে ব্যস্ত অনুপাতিক (Inversely proportional) কারণ আমাদের বিচার বিশ্লেষণ পদ্ধতি এখনো শুধু বর্ণনামূলক মাল-মশলার উপর নির্ভর করে যেগুলির বৈজ্ঞানিক মূল্য যৎসামান্য। স্নায়ুতন্ত্রের প্রকারগত বিশেষত্ব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অনেক বেশি।

এখানে যেটুকু আলোচনা করা হোল তা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যন্ত্রের স্বয়ংক্রিয়তা ও 'বুদ্ধি' যতই বেশি হোক, মানুষের কর্তৃত্ব ছাড়া সে ঠিকমত কাজ করতে পারেনা এবং কোন্ যন্ত্রের জন্য কি কি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পরিচালক চাই সেটা বুঝে লোক বাছাই না করলে কাজে সুফল পাওয়া যাবেনা।

কেউ কেউ বলেন যে, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র কৌশলের দৌলতে ভবিষ্যতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে আর শ্রমিকের প্রয়োজনই থাকবেনা। অতএব শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে জড়িত যা কিছু সামাজিক সমস্যা, সব কিছুর সুরাহা 'আপ্ সে' হয়ে যাবে। এই ধরনের মন্তব্য প্রধানত দেখা যায় ধনতান্ত্রিক দেশে। ১৯৫৩ সালে 'ওয়াল্ স্ট্রিট জার্নাল' মন্তব্য করেছিল যে, "কারখানা শিল্পের স্বয়ংক্রিয়করণের উদ্দেশ্য শ্রমিকদের হাত থেকে ষোল আনা রেহাই পাওয়া।" 'হার্স্ট' গোষ্ঠির সাপ্তাহিক পত্র 'ফর্চুন' আরো খোলসা করে লেখে :—"মানুষ এক বেয়াড়া চীজ। …কারখানা থেকে তাদের একেবারে বার করে দিতে পারলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যায়।"

কিন্তু সত্যিই কি তাঁরা বাঁচবেন? বিশিষ্ট মার্কিন বৈজ্ঞানিক ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নবার্ট ভেইনারের অভিমত অন্যরকম। ১৯৫৪ সালে তিনি লেখেন :—

"এটা জলের মত পরিষ্কার যে স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন এমন এক বেকার সমস্যা নিয়ে আসবে যার কাছে ১৯৩০ সালের অর্থনৈতিক সংকট ছেলেখেলা মাত্র।"

সমাজতান্ত্রিক দেশে যন্ত্র মানুষের বন্ধু, শ্রমিকের সহায়। মানুষকে বাদ দিয়ে যন্ত্রের কথা কেউ সেখানে চিন্তা করেনা, যন্ত্রের কথা চিন্তা করে মানুষেরই স্বার্থে। সেখানে যন্ত্রীকরণ বা স্বয়ংক্রিয়করণ যতই উচ্চাঙ্গের হোক, উৎপাদনে প্রধান ভূমিকা মানুষের হাতেই আছে এবং থাকবে কারণ মানুষের মূল্য ও গুণ যন্ত্রের চেয়ে বেশি। এই জন্যে সোভিয়েতে যন্ত্রের কাছ থেকে যতদূর সম্ভব ভাল ও বেশি কাজ যাতে আদায় করা যায় তার জন্য মস্কো, লেনিনগ্রাদ, তাশখন্দ, কীয়েফ, কাজান প্রভৃতি সহরে বিভিন্ন গবেষণাগারে শ্রমিক মনস্তত্ত্ব নিয়ে অনুসন্ধান চলেছে। যোগ্যতা বিচার করে শ্রমিকদের কাজে লাগালে তারা আধুনিক যুগের বিস্ময়কর স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বিজ্ঞানের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে সাম্যবাদী সমাজ রচনার চাহিদা অনুসারে বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনের যান্ত্রিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এবং সেইসঙ্গে উৎপাদন ক্রিয়াকে সময়ের বাঁধন থেকে মুক্তি দিয়ে এতদিনকার দৈনিক কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের অনেকখানিই সংস্কৃতি চর্চার জন্যে ব্যবহার করতে পারবে।

শিক্ষণে মনোবীক্ষণ

—মোহম্মদ আব্দুল করিম

শিক্ষায় মনস্তত্বের কথা তুললেই অনেক প্রশ্ন অনেক প্রসঙ্গের কথা ওঠে। বিজ্ঞানের অনেক দিকই শিক্ষার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত। তার মধ্যে মনস্তত্বই জুড়ে আছে একটা বিস্তৃত অঞ্চল। আর মনস্তত্বের আলোচনা করতে গেলে মন কি, কিভাবে তার প্রকাশ আর বিকাশ হয়, চেতনা, বোধশক্তি, ধারণা শক্তি চিন্তাশক্তি ইত্যাদির উন্মেষ কি ভাবে ঘটে, স্মৃতিই বা কি জিনিষ, বিস্মৃতিই বা হয় কেন, ইচ্ছাশক্তি আর মনোযোগ কাকে বলে,—এমনি অনেক বিষয়ের আলোচনা এসে পড়ে। স্বল্প পরিসর একটি মাত্র প্রবন্ধে সে আলোচনা সম্ভব নয়। কাজেই শিরোনামা যাই হোক আমার আলোচ্য বিষয় অত সর্ববিষয়ী নয়। ভূমিকায় শুধু এইটুকু বলব যে, যেহেতু মন জীবের স্নায়ুতন্ত্রের চরম বিকাশের পরিণাম আর মানুষের মন তার সর্বোচ্চ শিখরে তাই সেই মনকে শর্তাধীন পরাবর্তের সাহায্যে এবং সেই পরাবর্তের সর্বোত্তম উদ্দীপক বাক্য বা ভাষার সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ সংশোধন আর উন্নয়ন করা যায়। শিক্ষায় মনস্তত্বের এইটেই হল মূল কথা, নইলে শিক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টাই বাহুল্য, মানসিক যোগ্যতা পূর্ব নির্ধারিত এবং অপরিবর্তনীয়, বা মনের ধারা ও চরিত্র পূর্ব হতেই নির্দিষ্ট এই ধরনের চিন্তা বা ধারণা থাকলে সর্বজনীন শিক্ষার কথা ভাবাই যায় না। কিন্তু সর্বজনীন শিক্ষা প্রয়োজন এবং তা সম্ভব মনে করি বলেই শিক্ষীয় মনস্তত্বের কথা আমরা ভাবি আর সেই জন্যই শিক্ষা পদ্ধতির উন্নয়নের উপায় চিন্তা করি। আজকের আলোচনা তেমনি একটি চিন্তা-বিষয়ের উপস্থাপনা মাত্র।

শিক্ষা-ব্যবস্থা ও পদ্ধতি স্থান ও কালের উপর স্বভাবতই নির্ভরশীল হবে, শিক্ষাবিদরা তাই মনে করেন। স্থানীয় ভাবে সামাজিক অবস্থার আর সামগ্রিক ভাবে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও তার আদর্শের পরিবর্তন হয়েছে, তার মর্ম আর তাৎপর্যের ধারণাও বদলেছে। কিন্তু সকলেই এ বিষয়ে এক মত যে, মানব শিশুকে সমাজের আদর্শ রূপায়িত করে তোলার যোগ্য করতে হবে, তার ব্যক্তির বিকাশের দ্বারা তার জীবন ও কার্যকলাপকে সংগঠিত করতে হবে, কোন মানব সন্তানকে সমাজের কোন কর্মক্ষেত্রে কতটা ব্যবহার করতে বা অংশ নিতে দেওয়া হবে তা স্থির করেছেন সমাজের ভাগ্য নিয়ন্তারা, কাজেই শিক্ষার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য সমাজের কর্ণধাররাই স্থির করেছেন। তাই, কিছুদিন আগে পর্যন্ত সামাজিক তথা রাষ্ট্রিক প্রয়োজনীয়তা হিসাবে সার্বিক ও আবশ্যিক শিক্ষার কথা তাঁরা ভাবেন নাই। অন্যদিকে জীবনের তাগিদে, আপন প্রয়োজনের তাড়নায় যখন সাধারণ মানুষ ব্যাপক জনশিক্ষার পথে এগিয়ে এলো তখন সমাজের কল্যাণের দায়িত্ব যাঁদের অংশে তাঁরা একদিকে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন সে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার জন্য, আর অন্য দিকে মানব সন্তানের মানসিক যোগ্যতার অন্তর্নিহিত পরিমাণ নির্দিষ্টরূপে নির্ধারিত বলে শিশুর, বালক-বালিকার অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীর স্তর ভাগ করে শিক্ষা সংকোচনের উপায় আবিষ্কার করলেন। শিক্ষিতের সংখ্যা না বাড়লে রাষ্ট্রেরই বা কাজ চলবে কি করে? পুরনো রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষিতের সংখ্যা সীমিত হলেও চলত। কিন্তু আজ প্রায় সব রাষ্ট্রেরই শিল্প

উৎপাদনে বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার প্রয়োগের অবশ্যম্ভাবিতার জন্য অসংখ্য শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সর্ব্বোপরি যারা শিক্ষাকে সার্বিক এবং আবশ্যিক করার দায়িত্বকে স্বীকার করেছে, তারা চেষ্টা করেছে, শিক্ষা বিস্তার করার উৎকৃষ্টতম ও সহজতম পদ্ধতি বের করতে। অবশ্য আদর্শ শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগীরা ব্যক্তিগত ভাবেও শিক্ষাক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকে নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে কসুর করেন নি।

পাভলভ বলেছেন যে, শিক্ষা মানে মস্তিষ্কে অনুষঙ্গ সমাবেশ। তা থেকেই চিন্তার উন্মেষ, চিন্তার সংগঠন ও জ্ঞান। শিক্ষা করা মানেই হল জ্ঞান, কৌশল আর অভ্যাসের সচেতনভাবে আয়ত্ব-করণ। শিক্ষার মূল ভিত্তি ও নীতি হল সচেতনভাবে জানা। বালক বালিকাদের তাদের পাঠের উদ্দেশ্য বোঝাতে হবে এবং তবেই তারা ভাল ভাবে পাঠ্য বিষয় শিক্ষা করতে পারবে। সমাজের পক্ষে উপকারী স্থায়ী উদ্দেশ্য লালিত হলেই তবে, শিক্ষালাভের মানের উন্নতি হতে পারে। কিন্তু এই স্থায়িত্ব আর এই উপকারিতার উপলব্ধি তখনই সম্ভব যখন বালক বালিকারা নিজেদের অভিজ্ঞতার দ্বারা তা বুঝতে পারবে—অভিজ্ঞতা লাভের জন্য প্রয়োজন পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঠিক বিচার ক্ষমতা। এই বিচার ক্ষমতা সৃষ্টি করা, বুঝবার শক্তি, ও যোগ্যতা সৃষ্টি করা শিক্ষার একটি আবশ্যিক অংশ।

এই বোধ উচ্চ মস্তিষ্কের শারীরবৃত্তিক ক্রিয়ার ফল, আর সে ক্রিয়ারও সৃষ্টি হয় তখনই যখন একাধিক ঘটনা একই সময়ে পরস্পরের সংস্পর্শে আসে, একই সময়ে যখন একাধিক বিষয় উচ্চ মস্তিষ্কে প্রভাব সৃষ্টি করে। এই বিষয়গুলির পরস্পরের সহিত সংস্পর্শের ও সম্পর্কের উপলব্ধি হল বোধশক্তি। কিন্তু তা তখনই বাস্তব এবং অর্থপূর্ণ হয় যখন পূর্ব সম্পর্কের ধারণার ভিত্তিতে নূতন বিষয়গুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ধারণা সৃষ্টি হয়। এইখানেই প্রশ্ন আসে ঘটনা বিশ্লেষণের অর্থাৎ আবশ্যিক ও আকস্মিক যোগাযোগের বিচার এবং মনোযোগ, আগ্রহ, স্মৃতি, নৈপুণ্য, অভ্যাস ইত্যাদি মনের নানাবিধ ক্রিয়ার ও এবিষয়ে ব্যক্তির যোগ্যতার। এই সবই কিন্তু মূলত পরিবেশের প্রভাবের ব্যাপার। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাবের গুরুত্ব যেমন আছে তেমনি আবার মানুষের মধ্যে পরিবেশকে প্রভাবান্বিত করার, তাকে বদলাবার ক্ষমতাও আছে। আর সেই ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ আর যথার্থভাবে প্রয়োগ করার মত মানসিক গঠন শিক্ষার দ্বারাই সম্ভব। শিক্ষাই জ্ঞান লাভের উপায় আবার শিক্ষাই জ্ঞানকে কাজে পরিণত করতে অর্থাৎ প্রয়োগ করতে শেখায়। আর সেইখানেই শিক্ষকের দায়িত্ব।

একদিকে যেমন কোন কিছু শিক্ষা করার আসল মূল্য তাকে কাজে পরিণত করা, তেমনি অন্য দিকে শিক্ষা গ্রহণও বাস্তবে জীবন্ত হয়ে ওঠে কাজের মাধ্যমেই। প্রকৃত জ্ঞান লাভ আর শিক্ষার সার্থকতা সেইখানেই। জানা বা শিক্ষা করার বিষয় বস্তু হচ্ছে বিশিষ্ট নির্দিষ্ট, কিন্তু জ্ঞান হল অনেক বেশি বিস্তৃত. পরিব্যাপ্ত। কোন জিনিস ঠিক ভাবে জানতে হ'লে, সে সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হলে সেটা কি তা জানা নিশ্চয়ই দরকার, কিন্তু সেই জানাটাও সম্পূর্ণ হয় না যদি না জানি যে ওটা কি নয়, অর্থাৎ অন্য জিনিস বা বিষয়ের সাথে তার প্রভেদ কোথায়। অন্য বিষয় বা বস্তুর সাথে তার সম্পর্কটা কি, তার রূপ কি বা তার উপকারিতা-অপকারিতা কি, কি তার ব্যবহারিতা এসবও জানা দরকার। একটা বিষয় বা বস্তুকে যত ভাবে আর যত দিক থেকে দেখা বা জানা যাবে, তার সম্বন্ধে জ্ঞানও ততই আরও পূর্ণতা লাভ করবে। ফলে চিন্তাশক্তির সৃষ্টি আর বৃদ্ধি হবে, ছাত্রছাত্রীর বিয়োজন শক্তি সৃষ্টি হবে। শিক্ষক সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী ও শিক্ষাদান পদ্ধতি অবলম্বন করলে যে কোন একটি বিষয় শিক্ষা দিতে গিয়েই দেখবেন, স্মৃতি মনোযোগ ইত্যাদি সবই উৎকর্ষণযোগ্য। মেধাহীন, অমনোযোগী, স্মৃতিশক্তিরহিত ছাত্র বলতে সত্যিই কেউ নেই। শিক্ষার বিষয়বস্তু, ছাত্রের পরিবেশ, শিক্ষকের পদ্ধতি এই সবের যোগাযোগই ছাত্রের উন্নতির অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করে। আগ্রহ, মনোযোগ, বোধশক্তি ইত্যাদি শিক্ষক কি ভাবে জাগাতে পারেন তার কিছু নমুনা পরীক্ষা করা যাক।

প্রথমেই দুটি কথা বলে রাখি। শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের সামনে সমস্যা 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' নয়, আমাদের দায়িত্ব, যারা আছে যারা উদ্বর্তিত, তাদের সকলকেই যোগ্য করে তোলা। অর্থাৎ শিক্ষায় যারা মেধাবী, মনোযোগী 'ভাল' ছাত্র, তাদের দিকে নজর দিয়েই আমাদের দায়িত্ব শেষ নয়, যারা "ভাল" নয় তাদের ভাল হতে উদ্বুদ্ধ করা আমাদের বিশেষ দায়িত্ব। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের ধারণা শিশুরা, বালক বালিকারা বিশেষ চিন্তা ভাবনা করে না, যান্ত্রিক ভাবে ব্যবহার করে, কাজ করে। ধারণাটা ঠিক নয়। ওদেরও নিজস্ব মনোজগৎ আছে—বাস্তব কল্পনায় মেশানো জগৎ। ওদের চিন্তার ধরণ আর বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা হয় ভুল, নয়তো অস্পষ্ট। বয়স্কদের ধ্যান ধারণা দিয়ে ওদের বুঝতে চেষ্টা করা ভুল। অনেক ক্ষেত্রে শিশুদের চিন্তার বিষয়বস্তু এবং চিন্তাশক্তির মানও মনোবিদ্‌রা যাচাই করেছেন। এই কথাগুলি মনে রেখে অগ্রসর হ'লে পরবর্তী আলোচনা ও ব্যাখ্যার সঠিক উপলব্ধি ও মূল্যায়ণ সম্ভব হবে। প্রথমে সামগ্রিক ভাবে পাঠ্য বিষয়ের আলোচনা করা যাক, তারপর নির্দিষ্ট বিষয়ের আলোচনার মানও মনোবিদ্‌রা অবতারণা সহজ ও যুক্তিযুক্ত হবে।

শিশুরা শুধুই শিশু নয়, মানবশিশু। তাদের বুদ্ধি বিবেচনা অপরিণত অপরিপক্ক হলেও তারাও ভাবে, ঘটনার হেতু বুঝবার আর ফলাফল জানাবার চেষ্টা করে। বুঝিয়ে বলতে পারলে, তার অভিজ্ঞতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উদাহরণ দেখাতে পারলে, সে অনেক কিছু হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। নিজেদের মত করেই তারাও ভাবে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যোগসূত্রের কথা, তারাও বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে মিল খোঁজে, পার্থক্য-প্রভেদ বুঝতে চেষ্টা করে। এইগুলি মনে রাখলে শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের প্রতি যথার্থ মর্যাদা প্রদর্শন হয় আর শিক্ষকেরও পাঠদানে উৎসাহ আসে। ছাত্রছাত্রীও উদ্বুদ্ধ হয়, পাঠে তাদের আগ্রহ ঔৎসুক্য বাড়ে।

বিদ্যালয়ে, স্কুলে মাদরাসায় পাঠ্য বিষয় আছে অনেক। অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বিজ্ঞান ইত্যাদি তো আছেই তার উপর আছে ভাষা—একটি নয় দুটি নয় কয়েকটিই—বাংলা. ইংরাজী, হিন্দী, এর পর আছে সংস্কৃত আরবী ফার্সী। ইদানিং কালে একাদশ শ্রেণী আর সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের দৌলতে শিক্ষণীয় বিষয় আর পাঠ্যপুস্তকের ভার আরও বেড়েছে। ছাত্ররা ভাবছে এ বোধহয় এক প্রকার শাস্তি! সত্যিই এটা শাস্তি না কল্যাণান্তিক এটা তাদের বুঝিয়ে বলা দরকার। মাঝে মাঝে ছাত্র ছাত্রীদের কাছে পুরনো ব্যবস্থার পরিবর্তে নতুনের আবশ্যকীয়তার কথা বুঝিয়ে বললে তাদের ভার কিছুটা লঘু বোধ হ'তে পারে। সামর্থ্যবহির্ভূত দায়িত্বের প্রতি বিরূপতার বদলে জাগতে পারে ফলপ্রসূ বিদ্যা অর্জনের জন্য পাঠ্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য এটা খুবই কার্যকরী এবং জরুরী। নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের মনেও থাকে আর এক রকমের প্রশ্ন। প্রায়ই দেখেছি ছাত্ররা প্রশ্ন করে, স্যার এটা পড়ে কি হবে, ঐ বিষয়ে আমরা না জানলে কিই বা আসে যায়? বেশীর ভাগ ছাত্ররাই এই ধরনের প্রশ্ন করে অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল বা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে। প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক, কারণ প্রথমতঃ তারা এই জ্ঞানের সার্থকতা উপলব্ধি করে না, দ্বিতীয়তঃ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি এবং সামগ্রিক জ্ঞান লাভের জন্য সকল বিষয়ের মিলিত প্রভাব যে কি হতে পারে, সে সম্বন্ধে কোন ধারণা দেওয়ার চেষ্টা কখনও হয় না। বিদ্যালয়ের সমগ্র পাঠ্যব্যবস্থাই হ'ল যান্ত্রিক, বিভিন্ন পাত্র থেকে ভিতরের বস্তু একটি পাত্রে ঢেলে দেওয়ার মত, বিভিন্ন শিক্ষক এসে আলাদা আলাদা ভাবে তাঁর বিষয়ের জ্ঞান ছাত্রের মগজে ঢেলে দিয়ে যান। বোঝা বা না বোঝা, পরীক্ষায় সফল হওয়া বা বিফল হওয়ার দায়িত্ব ছাত্রের নিজের। পরীক্ষায় সফল হওয়াই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য কি? অথচ এই সাধারণ ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করলে পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়, বিদ্যালাভের প্রেরণা যোগান যায়। এবং এটা সম্ভব।

ইতিহাস পাঠের কথাই ধরা যাক। ইতিহাসকে চিত্তাকর্ষক করে পড়াতে হ'লে দরকার হয় মানচিত্রের। দেখাতে হয় আকবরের রাজত্ব কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল, রাজধানী দিল্লী কোথায় অবস্থিত, চিতোরের যুদ্ধ কোথায় ঘটলো, বাংলা আক্রমণ করতে গিয়ে আকবর নৌবাহিনী ব্যবহার করলেন কেন ? কাজেই ভূগোলের প্রশ্ন আসে। ইতিহাস পড়তে গিয়ে ভূগোলের প্রয়োজনীয়তা এমনি ভাবেই ফুটিয়ে তোলা যায়। বলা যায় বাংলা দেশের পাট আর ধানের কথা, অন্য দেশের গম আর তুলোর কথা। সহজেই টেনে আনা যায়, জমিদারী ব্যবস্থা আর জায়গীরদারের বিদ্রোহের ইতিহাস আর আকালে চাষীর মৃত্যুর কথা। রাষ্ট্রনীতি আর অর্থনীতির সাথে ঐতিহাসিক ঘটনার যোগাযোগ, দেশ জয় এবং পদানত করার চেষ্টার প্রেরণার সূত্র বোঝান যায়। সংস্কৃতির বিকাশ, সমাজ বিজ্ঞানের আলোচনাও অবান্তর নয়, সরস ভাষায় বললে দুর্বোধ্যও নয়। এমন কি অঙ্কশাস্ত্রের কথাও বলা যায়—সরকারের আয় বাড়ল কত, সৈন্য সংখ্যা কত, ফসলের দাম কত, ওজনই বা কত ইত্যাদি। একটা বিষয় পড়াতে গিয়ে এমনি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং সেগুলি জানার গুরুত্বও বোঝান যায়।

এখানে একটি কথা বলা দরকার। অনেককাল পরে আমাদের দেশের শিক্ষাবিদরা ইতিহাসের পাঠ্যসূচী রচনার গলদ বুঝেছেন। বুঝেই এখন যুগাবলম্বী ইতিহাস শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু ছাত্রদের কাছে এখনও তার কোন তাৎপর্যই নেই। ইতিহাসের প্রকৃত অর্থই তাদের বোঝানো হয় না। ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক রচনা ও পাঠদান যেভাবে হয় তাতে পাঠ্যসূচী রচনার এই নতুন পদ্ধতির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। যুগের ধারা, যুগের বৈশিষ্ট্য, সমগ্র যুগের একটা সম্পূর্ণ চিত্র কি, পাঠ্যপুস্তকে কি পাঠদানে কোথাও প্রকাশ পায় না। এক একটি দেশের ঘটনা এক একটি অংশ বা অধ্যায়ভুক্ত, বিষয়বস্তুগুলি যেন বিভিন্ন কক্ষে রক্ষিত, পরস্পরের সাথে কোন যোগ নেই। নেই কোন কালধর্মী সূত্র যার দ্বারা কোন যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। মধ্যযুগে ইসলাম ধর্মের কথা পড়তে গিয়ে কেনই বা তার মধ্যে ফরাসী দেশের শর্লিমানের কথা আর কেনই বা লাফ দিয়ে ভারতের হর্ষবর্দ্ধনের কথা পড়তে হবে তার কোন হদিশ পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় না কোন ব্যাখ্যা। এক ক্লাসে একটানা ভাবে কেন ভারতের বা ইসলামের ইতিহাস পড়ে যাব না, তার মর্ম বা হেতু ছাত্ররা বোঝে না। কাজেই তাদের কাছে ইতিহাস কতকগুলি ঘটনার বিবরণ মুখস্থ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা সকল ছাত্রের মনঃপুত নাও হতে পারে। ইতিহাস পাঠে তার অনুরাগ যদি না জন্মায়, ক্লাসে তার মনোযোগ যদি না থাকে তার জন্য সব দায়িত্ব তার নয়।

ইতিহাসকে অর্থপূর্ণ আর সরস করার আর একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। আধুনিক যুগের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করলে সুবিধা হবে। শিক্ষক বিশ্বের মানচিত্র খুলে ধরেছেন। এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তে আরব মরুভূমি। তার পশ্চিমে মিসর, মধ্যস্থলে লোহিত সাগর, একদিকে তার ভূমধ্যসাগর অন্যদিকে আরবসাগর যার প্রসার ভারতের উপকূলব্যাপী। অপরদিকে ভূমধ্যসাগরের চারপাশের দেশ স্পেন, ইতালী, আর আরও ওপরে ফরাসী দেশ আর ইংলণ্ড। এই মানচিত্র লক্ষ্য করে ইতিহাস পড়লে সহজেই চোখে পড়বে যে, একদিন যে-পথে আরব আর মিসরীয়গণ ভারতের সাথে বাণিজ্য করে লাভবান আর সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল সেই পথেই এসেছে ওলন্দাজ, পর্তুগালী, ফরাসী আর ইংরেজ বণিকরা আর সেই পথের উপর দখল জমানোর জন্যই মধ্যপ্রাচ্যের উপর তাদের এত দাপট আর সুয়েজ খালের রাজনীতি। তা ছাড়া এই পথের উপর কবজা করার আগে এশিয়ার বাজারে অধিকার সৃষ্টির জন্য তারা খুঁজেছেন নতুন পথ, আফ্রিকা ঘুরে অকুল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে। তাও সম্ভব হয়েছে, ইতালীর পতনের পর যখন স্পেন আর পর্তুগাল বাণিজ্যক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করল। তার কারণ, ইতালী ভূমধ্য সাগরের ভিতরের দিকের দেশ, পরিধি তার সীমাবদ্ধ। অপর দিকে স্পেন বা পর্তুগাল ভূমধ্য সাগরের বাহিরের দিকে

পশ্চিম প্রান্তে, যার পরেই বিশাল সুদূর বিস্তৃত অতলান্তিক মহাসাগর যার পারে দাঁড়িয়ে নতুন পথ আবিষ্কারের স্বপ্ন দেখা চলে। প্রথম উদ্যোগে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবার সম্ভাবনা। স্পেন আর পর্তুগালের চোখ খুললো। উদ্যোগ করল তারাই, নাবিকরা যদিও ছিল ইতালীয়। তাই আমেরিকায় তারাই প্রথম ঢুকলো। ইতিহাসের ঘটনাবলীর কার্যকারণ আর তাৎপর্য পরিষ্কার হয়ে যায়, আকস্মিকতার ধোঁয়াটে আবরণ ছিন্ন হয়ে যায়। ছাত্রদের ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, নীরস ঘটনাপঞ্জি পাঠের ভীতি দূর হয়। আমার এক বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম, তিনি ভূগোল পছন্দ করতেন না, নীরস মনে করতেন। কিন্তু শিক্ষণ শিক্ষাকালে ভূগোলের অধ্যাপক এমন চমকপ্রদ এবং সরসভাবে বিষয়টি উপস্থিত করেছিলেন যে, আমার বন্ধুটি ভূগোলের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি ভূগোলে বিশেষ শিক্ষা লাভ করেন।

অঙ্কের পাঠ দেওয়ার সময় যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝাতে পারলে একথা আর তত তীব্রভাবে মনে হয় না যে, বাবাঃ চার চারটে বিষয় শিখতে হবে। তা ছাড়া এটা বুঝান খুব কঠিন নয় যে, ‘গুণ’ যোগেরই আর একটা রূপ, বা বিয়োগ ভাগেরই আর একটা ধরন। তা ছাড়া একটি সংখ্যার তাৎপর্য বুঝাতে হলে বিভিন্ন ভাবে তা উপস্থিত করা উচিত। নইলে জ্ঞান যা হয় তা বিশেষ একটি রূপের সাথে আবদ্ধ হয়ে থাকে। অন্যরূপে তাকে চেনা যায় না। যেমন ধরুন সংখ্যা ‘৪’। ২+২ চার হয়, ২×২ চার হয়, ৩+১ ও চার হয় আবার ৪+০ চার হয়, ভাগ করলেও ১২÷৩ চার হয়। তা হ’লে ৪ বলতে ঠিক কি বুঝায় তা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সরল আর বক্র রেখা একই সঙ্গে উপস্থিত করলে তবেই সরলতা আর বক্রতার অর্থ পরিষ্কার হয়। কিন্তু সরল বা বক্র রেখা বার বার একই ভাবে অবস্থিত দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে অন্যভাবে তা দেখলে না চেনার বা ভুল চেনার সম্ভাবনা থেকে যায়। সে ক্ষেত্রে জ্ঞানলাভ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই বিভিন্ন ভাবে একই বিষয় দেখান বা বুঝান উচিত।

সোবিয়েৎ মনস্তত্ত্ববিদ মেনকিন্সকায়া তাঁর ‘শিক্ষায় মনস্তত্ত্বের কয়েকটি দিক’ শীর্ষক প্রবন্ধে ষষ্ঠ শ্রেণীর (১২।১৩ বৎসর) ছাত্র ছাত্রীদের জ্যামিতি শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপার সম্বন্ধে লিখেছেন যে, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর জন্য যে সব দৃশ্যমান রূপ বা বস্তুর ব্যবহার হয় জ্ঞানের পূর্ণতার জন্য তার হের ফের বা পরিবর্তন প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ তিনি একটি ছাত্রকে একটি বৃত্ত আর ব্যাসরেখা আঁকতে বলেন। ছাত্রটি চিরাচরিত প্রথায় একটি বৃত্ত এবং অভ্যস্ত স্থানে দুটি ব্যাস রেখা এঁকে দেয়। যখন প্রশ্ন করা হয় যে, একটি বৃত্তে কয়টি ব্যাস হয়, তখন সে উত্তর দেয় দুইটি। পরীক্ষক ঠিক সেই স্থানগুলিতেই আরও দুটি ব্যাস রেখা টেনে আবার প্রশ্ন করেন, কয়টি ব্যাসরেখা হতে পারে? তখন ছাত্রটি ঐ চিত্র দেখে জবাব দেয় যে চারটি। তখন অন্য এক স্থানে আর একটি ব্যাসরেখা টেনে তাকে প্রশ্ন করা হয়। এইবার ছাত্রটি উত্তর দেয় যে একটি বৃত্তের মধ্যে যতগুলি ইচ্ছা ব্যাসরেখা টানা যায়। তা হ’লে বোঝা যাচ্ছে যে, সাধারণভাবে ছাত্ররা ব্যাসরেখা সম্বন্ধে জানলেও, এইটুকুই শুধু জানে যে ওটা একটি রেখা, যা বিশেষ একটি স্থানে বৃত্তের কেন্দ্র ভেদ করে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে গিয়ে মেশে। কিন্তু ব্যাসরেখার পূর্ণ তাৎপর্য এবং সে সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি তাকে বিভিন্ন ভাবে ভিন্ন অবস্থায় দেখার ফলেই সম্ভব হয়েছে।

অঙ্কশাস্ত্র বিমূর্ত চিন্তাশক্তি আর বিয়োজন ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। এই জাতীয় চিন্তাশক্তির উদ্রেক ও যোগ্যতার বৃদ্ধি শুধুমাত্র দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে চিত্র দেখে হয় না, ভাষায় তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হয়। কারণ বিমূর্ত চিন্তা বস্তু বিয়োজনের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। তার জন্য শুধু এইটুকু বুঝতে পারাই যথেষ্ট নয় যে অমুক গুণটি মুখ্য, বাধ্যতামূলক, অপরিহার্য আর অমুকটি গৌণ এবং পরিবর্তনীয় বা পরিহার্য। সেখানে পরিবর্তনীয় আর অপরিবর্তনীয় উভয়কেই উপস্থিত করে তার মর্ম আর প্রভেদ বুঝিয়ে দিলে তবেই বোধটা সম্পূর্ণ হয়। আর এইভাবে

বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য দরকার ভাষার ব্যবহার। ব্যাসরেখার কথাই ধরা যাক। ব্যাসরেখার অপরিবর্তনীয় ‘গুণ’ হল বৃত্তের একপ্রান্ত থেকে শুরু করে একটি সরল রেখা কেন্দ্রবিন্দু ভেদ করে বিপরীত দিকে প্রান্তে গিয়ে মিশবে। তার পরিবর্তনীয় ‘গুণ’ হল তার উৎপত্তি বিন্দু, অর্থাৎ বৃত্তপরিধির যে-কোন স্থান থেকে ব্যাসরেখা টানা যায়, শুধু শর্ত হল যে সে রেখা কেন্দ্রবিন্দু ভেদ করে বিপরীত দিকে সোজা গিয়ে অপর প্রান্তে পরিধির সাথে মিশবে।

চাক্ষুষ উদাহরণ এবং ভাষা উভয়েরই সাহায্য ছাড়া কোন কিছুর সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান সম্ভব নয়। একথা যখন প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সত্যি তেমনি আবার প্রত্যেকটি নতুন বিষয়-শিক্ষার ক্ষেত্রেও সত্যি। কারণ ছাত্রের বয়স বৃদ্ধির আর শিক্ষার উন্নতির প্রত্যেকটি পর্যায়ে, জ্ঞানের নতুন স্তরে পৌঁছাতে হলে আবার চাক্ষুষ উদাহরণ এবং ভাষায় তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। এমনি ভাবেই পূর্বজ্ঞানের ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে নতুন জ্ঞান আর গড়ে ওঠে ছাত্রের বিমূর্ত্ত (abstract) চিন্তাশক্তি। আর এই চিন্তাশক্তিই মানুষের বৈশিষ্ট্য; কর্মক্ষেত্রের সকল বিভাগের উন্নতি সাধনে অপরিহার্য।

পরিশেষে বক্তব্য, শিশু-মন সম্পর্কে প্রচলিত সহজাত-প্রবৃত্তিমূলক ধ্যান-ধারণার নিরসন ঘটা একান্ত দরকার। ফ্রয়েড, ম্যাকডুগালের তত্বকথা মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের অধুনালব্ধ তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ‘নেচার ও নারচার’—দুটো কথা বারবার ব্যবহৃত হলেও, ‘নেচার’কেই অর্থাৎ জন্মগত বা বিধিদত্ত মনন শক্তিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন শিক্ষক অভিভাবকের দল। শিক্ষার্থীর বাস্তব পরিবেশ, পূর্ব্বার্জ্জিত ধ্যানধারণা, ভাববেগকে আদৌ আমল দেওয়া হয় না। পারস্পরিক সহযোগিতামূলক শিক্ষা বন্দোবস্ত স্কুল-কলেজে নেই, বরঞ্চ প্রতিযোগিতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। পেছিয়ে পড়া ছাত্রকে এগিয়ে নেবার পরিবর্তে, এ ব্যবস্থা তার মনে হীনমন্যতার ভাব জাগিয়ে তাকে আরও পেছনে পাঠাতে সাহায্য করে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে, আমাদের দেশ-কাল উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সব রকমের গোঁড়ামি ছেড়ে, সমাজ বিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় শিক্ষণ সম্পর্কিত আলোচনা গবেষণা ও প্রয়োজন হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো, আজকের দিনে সব চেয়ে জরুরী কর্তব্য।

[তুই]

এ যাবৎ মন সম্পর্কে কোন কিছু ধারণা বা জ্ঞান অর্জন করতে গিয়ে মানুষ অন্তর্দর্শনের সাহায্য নিয়ে এসেছে। আদিম মানুষ প্রকৃতির রহস্য বোঝবার জন্যে যেমন আজগুবি কল্পনার আশ্রয় নিতেন এবং প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যায় প্রকৃতি-বহির্ভূত আধ্যাত্মিক বা দৈবশক্তির কল্পনা করতেন, ঠিক তেমনি এখনও তথাকথিত মনস্তাত্ত্বিকের দল দেহ-মন-বহির্ভূত পরমাত্মিক শক্তির কল্পনা ছাড়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মানসিকতার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পান না। এই রকম কাল্পনিক শক্তিকে ফ্রয়েড ইদ, ইগো, সুপার ইগো, বলে আখ্যাত করেছেন। উনিশ শতকের জীববিজ্ঞানীর জীবনী শক্তি কল্পনার মতই এই দুর কল্পিত-অনুমান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অচল। প্রাক্-পাভলভ যুগে সত্যিকারের মনোবিজ্ঞান গড়ে ওঠেনি।

পাভলভ ও তাঁর আবিষ্কারের সম্যক্ পরিচয় দিতে হলে পাভলভের পূর্বসূরী সেচেনফ্ (Sechenov) সম্বন্ধে তুই একটি কথা বলা দরকার। এই সেচেনফই বোধ হয় প্রথম শারীরবৃত্তবিদ্ যিনি পুরোপুরি বস্তুবাদী দর্শনের দৃষ্টিতে মানসিকতার মস্তিষ্কাশ্রিত কার্যকলাপের সন্ধান করেন। তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক, যিনি এ কথা জোরের সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন যে মন দেহ নিরপেক্ষ তো নয়ই, বরঞ্চ দেহের একটি অংশ, মস্তিষ্কের, বিশেষ ধরনের বৃত্তি। ডারউইনের 'অরিজিন্ অব্ স্পেসিস্' প্রকাশিত হবার মাত্র চার বছরের মধ্যে সেচেনফের বহু আলোচিত পুস্তক 'রিফ্লেক্সেস্ অব্ দি ব্রেণ' (১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) তখনকার দিনের পাদ্রীপুরুতদের আধ্যাত্মিক ধারণামূলে— ভাববাদী দর্শনের সুরক্ষিত তুর্গদ্বারে হেনেছিল প্রচণ্ড আঘাত। তুর্গের পতন ঘটেনি বটে, কিন্তু চার দেয়ালেই কাঁপন লেগেছিল। জারের দরবারে সোরগোল উঠেছিল।

সেচেনফ্ পরাবর্ত (Reflex) কে কেন্দ্র করে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। পরাবর্তের তিনটি পর্ব। প্রথম পর্বে, বহির্জগতের উদ্দীপনা ইন্দ্রিয়ের গ্রাহক অংশকে (চোখ, কান, নাক, ইত্যাদি) উত্তেজিত করে ; দ্বিতীয় পর্বে, এই উত্তেজনা-তরঙ্গ নার্ভ মারফত মেরুদণ্ড বা মস্তিষ্কে গিয়ে পেঁছায়। এখানে আবার নানারকম জটিল স্নায়ু-সংযোজন ঘটে ; তৃতীয় পর্বে, এই উত্তেজনা-তরঙ্গ বহির্বাহী নার্ভের মারফতে গিয়ে পেশী বা গ্রন্থিকে সঙ্কুচিত করে। নিম্নপ্রাণীর মধ্যে এই পরাবর্ত ক্রিয়া নিয়ে বহুবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এর আগে হয়েছিল এবং তার থেকে মেরুদণ্ডের উত্তেজনা নিস্তেজনা সম্পর্কিত সম্যক জ্ঞান শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ লাভ করেছিলেন

সেচেনফ্ বললেন, মানসিক ও আত্মিক সব রকমের ক্রিয়া-কলাপই মস্তিষ্কের কোন না কোন রকমের পরাবর্ত ; অন্যান্য স্নায়ু-প্রক্রিয়ার সঙ্গে মনন ক্রিয়ার সংঘটনকারী পরাবর্ত ক্রিয়ার কোন তফাত নেই।

তিনি বললেন : "The brain is an organ of the spirit i.e. a mechanism which when brought into activity by any kind of cause produces as a final series that fines of

external phenomena which we characterise as psychical activity." মনোজগতের সংখ্যাতীত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিল ক্রিয়াকলাপ মস্তিষ্কের কোন না কোন পরাবর্ত-সঞ্জাত—আপাত-দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হলেও—এ ধারণা সত্য। মানসিক ক্রিয়াকলাপের, সে যে কোন ধরনেরই হোক না কেন,—প্রকাশ শেষপর্যন্ত পেশী সংকোচনে—বললেন সেচেনফ ঃ হয় কাজে, নয়ত লেখায় বা কথায়। খেলনা হাতে পেয়ে শিশুর আনন্দ--প্রথম প্রেমের আবির্ভাব-চিন্তায় নারীরদেহের মৃদু কম্পন, পিতৃভূমিকে ভালবাসার অপরাধে দণ্ডিত গ্যারিবল্ডির হাসি,—এ সবেরই অভিব্যক্তিতে দেখতে পাই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পেশীর সঙ্কোচন। কথা বা লেখাও কতকগুলি বিশেষ জায়গার পেশীর সঙ্কোচনজাত ক্রিয়া।

এ হল পরাবর্তের তৃতীয় পর্বের কথা।

এর পর তিনি দেখাতে চেষ্টা করলেন যে এই সব মানসিক ক্রিয়াকলাপের মূলে পরাবর্তের প্রথম পর্বের স্নায়ু উত্তেজনা বর্তমান। অর্থাৎ বাইরের কোনো উদ্দীপক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহী-অংশকে উদ্দীপ্ত করার ফলেই এই তৃতীয় পর্বের অভিব্যক্তি অর্থাৎ পেশী সঙ্কোচন ঘটছে। এখানে সেচেনফ্ প্রচলিত দুটি তত্ত্বের সাহায্য নিলেন। প্রথমটি লকের দার্শনিক মতবাদ—মানসিক সমস্ত জটিল ধ্যানধারণাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সরল অনুভূতির সমন্বয়। দ্বিতীয়টি নিম্নশ্রেণীর পরাবর্ত সংক্রান্ত অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক ধারণা যে বহির্বাস্তবের উদ্দীপনা ছাড়া পরাবর্তক্রিয়া ঘটতেই পারে না। এ দুটিকে মিলিয়ে সেচেনফ এই সিদ্ধান্তে পেঁছুলেন যে মননক্রিয়া পরাবর্তের প্রথম ও তৃতীয় পর্বের অনুষ্ঠান মেনে চলে। এখন প্রমাণ করা দরকার যে ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা ও পেশী সঙ্কোচনের মধ্যে মস্তিষ্কের ক্রিয়া নিহিত রয়েছে অর্থাৎ মস্তিষ্ক মাধ্যমেই সংযোজনের ফলে গ্রাহী উদ্দীপনা বহির্বাহী উদ্দীপনায় রূপান্তরিত হচ্ছে, যার ফলে ঘটছে পেশী-সংকোচন। তাহলেই মনন ক্রিয়াকে পরাবর্ত বলতে আর কোনো বাধাই থাকে না। এখানেও সেচেনফ নিম্নপ্রাণীর উদাহরণ দিয়ে তাঁর তত্ত্বকে সপ্রমাণ করার চেষ্টা করলেন। বলা বাহুল্য তাঁর এ বিপ্লবী ধারণাকে সুসংস্কৃত ও যথাযথভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছিল পরবর্তীকালে পাভলভ উদ্ভাবিত বিশেষ পদ্ধতির পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা। এর উল্লেখ মানব মনের প্রথম সংখ্যাতে করেছি।

সেচেনফের ধারণাগুলি প্রমাণসাপেক্ষ হলেও খুবই চিত্তাকর্ষক ছিল নিঃসন্দেহে। তিনি অনুমান করলেন, মস্তিষ্কে এমন কতকগুলি কেন্দ্র আছে যাদের কাজ পরাবর্তের তৃতীয় পর্বকে প্রভাবিত করা। পেশী সংকোচনের হ্রাস বৃদ্ধির মূলে রয়েছে এই কেন্দ্রগুলির ক্রিয়াকলাপ। অবশ্য এ ক্রিয়াকলাপও বহির্জগতের ঘটনা বা উদ্দীপকের উপর নির্ভরশীল। এই প্রসঙ্গে মস্তিষ্কের নিস্তেজনা [inhibition] নিয়ে তিনি আলোচনা করেন।

পুরস্কারের লোভ বা শাস্তির ভয় দেখিয়ে শিশুর ব্যবহারকে প্রভাবিত করা যায়। বহির্বাস্তবের উদ্দীপকের প্রভাবেই শিশু অনেক ইচ্ছা দমন করে, অনেক অবাঞ্ছিত কাজ পরিহার করে। সামাজিক কারণে বড়দেরও অনেক রকমের মনোভাব ও আচরণ দমন ও নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষিত নিম্নপ্রাণীর মেরুদণ্ডের স্নায়ু নিস্তেজনার সঙ্গে সেচেনফ এ ব্যাপারগুলো তুলনা করে বললেন—এগুলো মস্তিষ্কের বিশেষ কেন্দ্রের নিস্তেজনার ফল।

সেচেনফের মতে চিন্তা হচ্ছে অনুচ্চারিত কথা। পরাবর্তের তৃতীয় পর্ব অর্থাৎ স্বরযন্ত্র, জিহ্বা ইত্যাদি স্বরোৎপাদক পেশী সংকোচন দমনের ফলে চিন্তার জন্ম। তাঁর ভাষায়—"In a thought, we have both the beginning of a reflex and its continuation ; only the end of the reflex (i.e. the movement) is apparently absent." আবার প্রক্ষোভের বেলায়—পরাবর্তের তিনটি পর্বই কাজ করছে, উপরন্তু তৃতীয় পর্বের ক্রিয়াকলাপ—পেশী সংকোচন, অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। কোনো বিশেষ কারণে বা মস্তিষ্কের বিশেষ অবস্থায়—উদ্দীপকের সাড়া স্বাভাবিকতার সীমা ছাড়িয়েছে।

এইভাবে, সংবেদন, উপলব্ধি, সংকল্প, স্মৃতি, কল্পনা, প্রেম্, বাৎসল্য ইত্যাদি মনের সমস্ত আবেগ অনুভূতিকে সেচেনফ মস্তিষ্কের পরাবর্তক্রিয়ারূপে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন। আত্মিকক্রিয়ার প্রেরণা সব সময়েই জাগতিক ও পরিবেশের প্রভাবাধীন—এই ছিল তাঁর বক্তব্য। তদানীন্তন ভাববাদী ও ধর্মধ্বজীদের প্রচলিত প্রতিক্রিয়াশীল ধারণাকে আক্রমণ করলেন সেচেনফ। রাতারাতি তাঁর "Reflexes of the brain"এর নাম রাশিয়ার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। মন সম্পর্কিত এই বস্তুবাদী দলিলটিকে জার সরকার সহজভাবে নিতে পারলেন না। বইটি নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হল। তবে অধ্যাপক সেচেনফ উচ্চপদস্থ বন্ধুদের হস্তক্ষেপের ফলে নির্বাসনদণ্ড থেকে অব্যাহতি পেলেন।

শারীরবিগ্যার সম্যক জ্ঞান—মস্তিষ্কক্রিয়াকলাপের গবেষণা ছাড়া যে মনোবিগ্যার জ্ঞান লাভ অসম্ভব—এই ধারণাকে বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন সেচেনফ।

"Strictly adhering to the Principle of induction, physiology will begin with a detailed study of the more simple aspects of psychical life and will not rush at once into the sphere of highest psychologial phenomena. Its progress will therefore lose in rapidity but it will gain in reliability."—এই কথাগুলো উত্তরকালে পাভলভের গবেষণা ও পরীক্ষানিরীক্ষাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল নিঃসন্দেহ। ১৯১৫ সালে সেচেনফের দশম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে পাভলভ বলেছিলেন, "The application of the reflex principle to explain the activity of the higher nervous centres is a proof that causality can be applied to higher forms of organic nature. For this reason the name of Sechenov will forever remain dear to the Russian scientific world."

উচ্চতম মননক্রিয়া কার্যকারণ সম্প্‌ক্ত,—প্রাকৃত বিজ্ঞানের নিয়মশৃঙ্খলা মনোবিজ্ঞানেও প্রযোজ্য—সেচেনফের এই ধারণাদ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন আইভান পেত্রভিচ। তাই গড়ে উঠতে পেরেছে বাস্তববাদী মনস্তত্ত্ব—যাকে আজ অসঙ্কোচে মনোবিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া যায়।

আত্মিক ক্রিয়াকলাপের কার্যকারণ সম্পর্ক সেযাবৎ কোনও নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে বাঁধতে পারেননি বিজ্ঞানীরা; কাজেই নানারকমের রহস্যবাদ ও আধ্যাত্মিকবাদের প্রসার ঘটছিল। জাগতিক নিয়মশৃঙ্খলার হদিশ অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া গেছে যে মস্তিষ্কের সাহায্যে, সেই মস্তিষ্ক তখনও পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত দেশ। পাভলভ তাঁর বিশেষ পরীক্ষাপদ্ধতির সাহায্যে বহু উপাত্ত-তথ্য সংগৃহীত করলেন দীর্ঘদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে। এখন গবেষণাগারে উদ্দীপককে বিশ্লেষণ করা যায়, তার শক্তির তারতম্যও নিয়ন্ত্রণ করা চলে। তথ্যাদির সামান্যীকরণের ফলে মস্তিষ্কক্রিয়ার সাধারণ কতকগুলো সূত্র পাওয়া গেছে।

প্রথমতঃ তথ্যাদির সাহায্যে বোঝা গেল লালানিঃসরক গ্রন্থির উত্তেজনার একটি সার্বভৌম শর্ত আছে। খাগ্য দেখিয়ে গ্রন্থি উত্তেজিত করতে হলে প্রাণীটি ক্ষুধার্ত থাকা চাই। পেট ভরতি থাকলে পরাবর্তক্রিয়ার উন্মেষ ঘটবে না। এর থেকে আমরা এই ধারণায় আসতে পারি যে সমস্ত মননক্রিয়ার প্রধান সর্ত হল মস্তিষ্কের পূর্ব-প্রস্তুতি। মস্তিষ্কের যে জায়গায় বহির্বাস্তবের উদ্দীপক কাজ করবে. সে জায়গাটিতে আগে থেকেই উত্তেজনাপ্রবাহ সঞ্চারিত থাকা দরকার। এই আন্তরপ্রক্রিয়াকে যতদিন না বিজ্ঞানালোকে ভালভাবে বোঝা গিয়েছিল, ততদিন একে কেন্দ্র করে অজ্ঞেয়বাদ বা রহস্যবাদের তত্ত্ব সম্প্রসারণ সহজ ছিল। এই ব্যবহারের গূঢ় উদ্দেশ্যটিও পাভলভের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠল। খাগ্য-উদ্দীপক সব- সময়েই যদি প্রাণীকে উত্তেজিত করতে থাকে, তবে প্রাণীর পক্ষে অন্য উদ্দীপকে (আত্মরক্ষামূলক, বংশবৃদ্ধিমূলক), সাড়া দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। নতুন গুণ বা ধর্ম আয়ত্ত করাও যায় না। পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন হয় দুঃসাধ্য।

দ্বিতীয়তঃ, যদি খেতে না দিয়ে প্রাণীকে বারবার খাদ্য শুধু দেখানো হয়, তবে লালা নিঃসরণ ক্রমশঃ কমতে কমতে শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়াবে। প্রথম সংখ্যায় কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স-প্রসঙ্গে একথার উল্লেখ করেছি। আবার যে-মুহূর্তে এক টুকরো খাবার মুখে গুঁজে দেওয়া হবে, অমনি দেখা যাবে লালাগ্রন্থি পূর্ণমাত্রায় সক্রিয় হয়েছে; লালানিঃসরণের পরিমাণ পূর্ব মাত্রায় ফিরে গেছে। প্রকৃতির এ মিতব্যয়িতা প্রাণীর অভিযোজন সহায়ক নিঃসন্দেহ। বাস্তবে ফলপ্রসূ না হলে যত শক্তিশালীই হোক না কেন উদ্দীপক প্রাণীকে বেশীদিন উত্তেজিত করতে পারে না—প্রাণী মাত্রেরই অস্তিত্ব ও সুস্থতার পক্ষে এই ধর্ম অতি প্রয়োজনীয়। ছলনাময়ী মরীচিকা যে বেশীদিন প্রলুব্ধ করতে পারে না মানুষকে, মস্তিষ্কের এ একটা বিশেষ সদ্‌ধর্ম। তৃতীয়তঃ, জানা গেছে, একসঙ্গে দুটো উত্তেজক কাজ করতে পারে না। রুটি ও মাংস—এ দুই খাদ্যই কুকুরের সামনে উপস্থাপিত করা হল। নিজস্ব ধর্ম অনুযায়ী রুটির লালা নিঃসারক ক্ষমতা নরম মাংসের তুলনায় অনেক বেশী। রুটীভিজিয়ে চিবিয়ে গলাধঃকরণ করার জন্য চাই প্রচুর লালা। মাংস (ঝোল সমেত) গিলতে লালার প্রয়োজনই হয় না। এই দুই বিপরীতধর্মী (লালা নিঃসরণের দিক থেকে) খাদ্য পেলে কুকুর মাংসের দিকেই শুধু মন দেবে। লালা ঝরবেই না। কারণ মাংস অনেক বেশী শক্তিশালী উদ্দীপক। প্রকৃতির এই বিশেষ নিয়ম প্রাণীর কর্মক্ষমতাকে সচল ও সক্রিয় করে। একই সময়ে মস্তিষ্ক দুটি উদ্দীপক দ্বারা আকৃষ্ট না হওয়ায় মস্তিষ্কে কার্যকারিতা অনেক বেড়ে যায়। পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে মানিয়ে নেবার সুবিধা হয়।

এই সব প্রাথমিক জ্ঞান লাভের ফলে আরও বিস্তারিত হল পাভলভের গবেষণাক্ষেত্র। ক্রমশঃ তিনি জটিলতর পরীক্ষাবিধিতে মনোনিবেশ করলেন। মানসিকতার রহস্যগ্রন্থি ক্রমশঃ উন্মোচিত হতে লাগল।

[ক্রমশঃ]

মনরোগের কারণ নির্ণয় (১)

মনোবিৎ

অনেকের মতে মনরোগবিদ্যা আজও অনতিক্রান্ত শৈশব। কারণ মানসিকতা এখনও ভাববাদাশ্রিত রহস্যময়তায় আচ্ছন্ন। একজন আমেরিকান মনরোগবিদের মতে এ-বিদ্যা রসায়নবিজ্ঞানের সম্প্রাসরণের পূর্বযুগীয় কিমিয়াবিদ্যার সঙ্গে তুলনীয়। নার্ভতন্ত্রকে শান্ত করার 'ট্রানকুইলিইজার', ইলেক্‌ট্রিকশক, ইনসুলিন কোমা—ইত্যাদি নানারকমের হাতিয়ার থাকা সত্বেও, মনরোগকে আয়ত্তে আনা যাচ্ছে না। পশ্চিম ইয়োরোপ, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকায় এর প্রাদুর্ভাব ও বিস্তার ক্রমবর্ধমান। মনরোগের নিদানতত্ব এখনও অসংগঠিত ও প্রয়োগবিধি অনেকটা আনুমানিক। অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) প্রয়োগজাত তথ্যপ্রমাণ থেকে যতক্ষণ না একটা সামগ্রিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ তত্বের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, ততক্ষণ মনরোগবিদ্যা বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না। প্রকৃত কারণ না জানা পর্যন্ত কোনো রোগের প্রতিষেধক ও প্রতিবিধায়ক ব্যবস্থা অচিন্তনীয়। অপেক্ষাকৃত কম জটিল হলেও নিউরোসিসের সর্বদেশ-ব্যাপ্তি ও ক্রমপ্রসার মনরোগবিদ, মনস্তাত্বিক ও সমাজতাত্বিকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। নিউরোসিসের কারণ নির্ণয়ে পশ্চিমী দেশগুলির ভাববাদাশ্রিত পদ্ধতি ও তত্বগুলিই এখানে আলোচ্য।

অনেক পরস্পরবিরোধী তত্ব প্রচলিত :—যথা ফ্রয়েড, ইয়ুং অ্যাডলারের প্রবৃত্তিমূলক তত্ব, হর্নির সমাজ-সমস্যামূলক তত্ব, রাইখের নিগূঢ় তত্ব। এ-ছাড়া আছে সর্ব-সারগ্রাহী এক্‌লেক্‌টিক্‌ তত্ব। স্বল্প পরিচিত হলেও মধ্য ইয়োরোপে অধুনা প্রচলিত ফ্রাঙ্কল, কারুসো, ভ্যানডারবার্গ ইত্যাদি সমর্থিত অস্তিত্ববাদী [Existential] তত্ব ও উল্লেখ্য। অবশ্য ফ্রয়েড তত্বই সর্বজনবিদিত ও সর্বাধিক প্রয়োজিত; অন্যান্য মতবাদ ও তত্ব ফ্রয়েডতত্বেরই মার্জিত অথবা পরিবর্তিত সংস্করণ।

ফ্রয়েডতত্বের আদিকথা এই যে মানুষ মাত্রেই জৈব প্রবৃত্তির দাস। প্রবৃত্তির অচরিতার্থতা থেকে নিউরোসিসের জন্ম। সমাজ, বিশেষ করে পরিবার শিশুর নির্জ্ঞান কামাকাঙ্খার পথে যে সব বিধিনিষেধ আরোপ করেছে তার থেকে আসে অচরিতার্থ বা ব্যর্থতা, ফলে নিউরোসিস।

এই প্রবৃত্তি-সর্বস্ব তত্বকে মুখে নস্যাৎ করলেও এবং অধুনিক সমাজ ও সভ্যতাকে নিউরোসিসের কারণ বলে অভিহিত করলেও—নিওফ্রয়েডিয়ানদের লেখায় কোথাও এই সমাজব্যবস্থা বিশ্লেষণ করবার ঝোঁক লক্ষিত হয় না। কার্ডিনার ত পুরাপুরি ফ্রয়েডেরই অনুবর্তী। মাতৃস্তন্যপানবিরতি, শিশুচর্যা, মলমূত্রত্যাগের অভ্যাস—ইত্যাদি নিয়েই তাঁর গবেষণা। সমাজের বিন্যাস বা কাঠামো তাঁর আলোচনা-গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

অন্যান্য মনোবিৎ ও মনরোগবিদ্‌রাও শিশু মনের উপর পরিবার, বিশেষ করে পিতামাতার অস্বাস্থ্যকর প্রভাব নিয়েই প্রধানতঃ গবেষণা করছেন। পিতামাতার নিষ্ঠুরতা, স্নেহমায়াহীনতা, বিবাহবিচ্ছেদ, এবং অন্যান্য পারিবারিক কারণগুলোই বারবার করে সামনে তুলে ধরা হয়েছে। মোট কথা শৈশবের অহিতকর ও ধ্বংসাত্মক অভিজ্ঞতা থেকেই মাত্র নিউরোসিসের উদ্ভব—এ ধারণা ফ্রয়েডীয় আদি তত্বেরই সম্পূরক ও সহায়ক।

শুধু শৈশবের অভিজ্ঞতা থেকেই নিউরোসিসের উদ্ভব—ফ্রয়েডীয় এই তত্ত্বের ভ্রমাত্মক দিক নিয়ে খুবই কম আলোচনা হয়েছে। পিতামাতার নিষ্ঠুরতা বা অতিস্নেহপ্রবণতার সামাজিক কারণগুলিও অবিশ্লেষিত রয়ে গেছে। ফ্রয়েড তবুও পিতৃবিদ্বেষ ও সন্তানবিদ্বেষের কারণ হিসাবে তাঁর কামসর্বস্ব থিওরি ঈদিপাস কমপ্লেক্সের আমদানি করেছেন, তাঁর উত্তর সূরীরা কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে তাই মনে করেন নি। হর্নি ইত্যাদির লেখা বিবরণ-প্রধান—ব্যাখ্যামূলক নয়।

শিশু বয়সের বিরূপ ও অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা থেকে নিউরোসিস ঘটতে পারে—অস্বীকার করছিনা। কিন্তু পরিণত বয়সের মানসিক আঘাতে নিউরোসিস হবে না কেন? শৈশবের হতাদর অনাদরে যে মানসিক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে, পরবর্তীজীবনের সুস্থ পরিবেশে, সাফল্যজনিত আবহাওয়ায় সে ক্ষয়ক্ষতির পূরণ ঘটবে না কেন? সুস্থ পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে শৈশব অতিবাহিত করে বয়ঃসন্ধিতে বা যৌবনে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মনোবিকার জন্মাবে না কেন? মনরোগবিদ মাত্রেই নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে জানেন—ফ্রয়েডপন্থীদের তত্ত্ব অযৌক্তিক, অবাস্তব। শৈশবে অসুস্থ হলে সারাজীবন অসুস্থ থাকতে হবে কিম্বা শৈশব সুস্থভাবে কাটলে আর কোনো ঝড়ঝাপটাতেই মানসিক বিকার ঘটবে না, এই স্থিতিশীল ধারণা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক।

‘মানবপ্রকৃতি অপরিবর্তনীয়’—এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ফ্রয়েডীয় মতবাদ। মানব প্রকৃতির নিয়ামক ও নির্ধারক নির্জ্ঞান মনের গোপন গুহাচারী জৈব প্রবৃত্তি। জৈবপ্রবৃত্তি শাশ্বত ও সনাতন; সুতরাং মানবপ্রকৃতি অপরিবর্তনীয়,—এই হল ফ্রয়েড ও তাঁর অনুগামীদের মূল বক্তব্য। যাঁরা প্রবৃত্তিমূলক তত্ত্বে বিশ্বাসী নন বলে প্রচার করেন, তাঁরাও কিন্তু মনে করেন—শৈশবে একবার নিউরোসিসের সূত্রপাত হলে—আমরণ তাঁর ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে। পরিবেশের প্রভাবে ও মনের পরিবর্তনশীলতায় অনাস্থা এঁদের ধারণাতেও সুস্পষ্ট। এঁরাও ফ্রয়েডেরই মত সনাতনপন্থী।

অস্বাভাবিক ও অসুস্থ পারিবারিক অবস্থাকে নিউরোসিসের মৌল কারণ বলে মনে করা হচ্ছে; অথচ একবারও বলা হচ্ছে না এই পারিবারিক অসুস্থতার কারণ কি? অসুস্থ পরিবার যেন অনেকটা আপনা থেকেই জন্ম নিয়েছে। আধুনিক মনরোগবিদ্ সমাজের বিভিন্ন রীতিনীতির পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা করলেও—নিউরোসিসের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে শুধু শৈশবের তিক্ত অভিজ্ঞতার ও পিতামাতার অস্বাভাবিক ব্যবহারের কথাই তুলেছেন বারবার। গত এক'শ বছরে সমাজব্যবস্থার শোষণ ও প্রতিযোগিতার অস্বাভাবিক ও বিকৃতরূপের প্রতিফলন যে ব্যক্তি বা পরিবারের মধ্যে পড়তে পারে ও ব্যক্তিসম্পর্ক ও পারিবারিক সম্পর্ককে বিষাক্ত করে তুলতে পারে—এ সম্ভাবনা সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা নীরব। কেউ কেউ সামগ্রিকভাবে বর্তমান যন্ত্রসভ্যতা ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োগবিদ্যাকে দায়ী করেছেন, এইমাত্র। এই মনোভাবের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে ফ্রয়েডীয় পণ্ডিতেরা চৈতন্যের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় অবিশ্বাসী। নিউরোটিকের চিন্তা ও উদ্দেশ্য যে তার বর্তমান বিকৃত পরিবেশের প্রতিফলন—এ সহজ সত্যকে এঁরা এড়িয়ে চলেন বা বুঝতে পারেন না। কাজেই পিতামাতার অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিকে—এত ফলাও করে প্রচার করে থাকেন। সমাজের দুষ্ট ক্ষতগুলোর দিকে তাকাতেও চান না। পিতামাতার অস্বাভাবিক ব্যবহারের কারণ নির্দেশে পিতামহ পিতামহীর অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিকে টেনে আনেন—এবং এর জন্য এঁদের মাতাপিতার অর্থাৎ প্রপিতামহকুলের ব্যক্তিত্বের বিকারকে দায়ী করেন। অর্থাৎ বর্তমানকে এড়িয়ে বংশপরম্পরা মানসিক অস্বাভাবিকতার অব্যাহত ধারাকে দায়ী করেন নিউরোসিসের মৌল কারণ হিসাবে। নিউরোসিসের এই মানসিক বা সাবজেক্টিভ ব্যাখ্যা ভাববাদ দর্শনেরই এক বিশেষ রূপ।

বহুরূপে ভাববাদী ধারণা সমাজে প্রচলিত। এদের আসল সুর কিন্তু এক। —"পরম পুরুষ, অবিনশ্বর

আত্মা, বিশ্বজনীন ভাব বা আইডিয়া মুখ্য আর বাস্তব ধূলোমাটির জগৎ গৌণ—পরম পুরুষ বা পরমাত্মার লীলা; এক অপৌরুষের অবিনশ্বর শক্তি বাহ্য জগতের নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক ইত্যাদি আসলে এই বাস্তব জগতের অস্তিত্ব কেবলমাত্র আমাদের চিন্তায় বা কল্পনায়। অথবা বস্তুজগৎ অজ্ঞেয় অপ্রয়োজনীয়, আসল সত্য আমাদের চিন্তা ও ধ্যান ধারণা।" অবজেকটিভ সত্যকে সরাসরি বা কৌশলে অস্বীকার করার চেষ্টা ভাববাদের আসল উদ্দেশ্য। বলাবাহুল্য এ ধারণা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানের সঙ্গে এর বিরোধ মৌলিক ও আপোষ অসম্ভব। বিজ্ঞান অনেক পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেচে যে বস্তুজগৎ বিদ্যমান ও নিজস্ব নিয়ম শৃঙ্খলে বাঁধা। আমাদের অনুভূতি বা ধ্যানধারণানিরপেক্ষ এই বস্তুজগতের অস্তিত্ব। এ পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আবির্ভাবের বহু আগে থেকেই অসংখ্য বস্তুকণা সমন্বিত জগৎ বিদ্যমান ছিল। এই বস্তু জগতের নিয়ম শৃঙ্খলা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অনুশীলন দ্বারা জ্ঞেয়, অধিতব্য। সেই জ্ঞান ও বিদ্যা জাগতিক কল্যাণে প্রযোজ্য। প্রকৃতিবিজ্ঞান ক্ষেত্রে আজ ভাববাদের প্রভাব ক্ষীয়মান, কেননা প্রাকৃতবিজ্ঞান আজ স্বকীয় সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে সমাজ বিদ্যায় ভাববাদের আধিপত্য এখনও সুস্পষ্ট। তাই দেখতে পাই ইতিহাস বা জাতির গতিপ্রগতি ও কার্যকারণের ব্যাখ্যায় অভিপ্রায়িক প্রয়োজনকে অস্বীকারের চেষ্টা ও আধ্যাত্মিক শক্তি, রহস্যময়তা, অথবা মানুষের সহজাত শাশ্বত প্রকৃতির অবতারণা। বস্তুজগৎ ও সামাজিক পরিবেশ ও প্রয়োজন যে মানুষের চিন্তা ভাবনা ও ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে—এই বৈজ্ঞানিক সত্যের অপলাপ প্রচেষ্টা। মনোরোগ বিদ্যায় ভাববাদের প্রভাব দেখতে পাই ফ্রয়েডীয়দের তত্ত্ব ও প্রয়োগ ধারায়। মানুষের ব্যবহার বা চিন্তাধারা বিশুদ্ধ মানসিক কারণ সঞ্জাত এবং এঁদের মতে এই মানসিকতার সঙ্গে তার বাস্তব জীবনের পারিপার্শ্বিকের কোনো সম্পর্ক নেই, থাকলেও সে সম্পর্ক আনুসঙ্গিক মাত্র। মননক্রিয়া স্থান কাল পরিবেশ নিরপেক্ষ—নানাভাবে এই কথার পুনরাবৃত্তি করে যান এরা। মানুষের চিন্তাভাবনা ক্রিয়াকলাপের উৎস তার নিজের মধ্যেই অথবা তার নির্জ্ঞান মনে—এ কথার তাৎপর্য এই যে চিন্তা ভাবনা ক্রিয়াকলাপ বাইরের বস্তুজগতের প্রভাব মুক্ত। ফলে রহস্যবাদের দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া এই সব মনরোগবিদদের আর কোন গত্যন্তর থাকে না। হর্নির দলকে আভ্যন্তরীন বা সহজাত প্রেরণার (inner urge) সন্ধানে বুদ্ধ, তাও, কিয়েককেরগার্ড, বার্গসঁর দ্বারস্থ হতে হয়।

আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বিগ্রহ ও পারস্পরিক কলহ দ্বন্দ্বের কারণ খুঁজতে গিয়েও রাজনীতি, অর্থনীতি বা সামাজিক অন্তর্দ্বন্দ্বের দিকে এঁদের দৃষ্টি পড়ে না। এঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে শিশু মনের আক্রমণাত্মক ও অসহযোগিতামূলক ভাব ধারার দিকে। যার মূলে এঁদের মতে কেবলমাত্র সহজাত প্রবৃত্তি অথবা পারিবারিক কারণ। শুধু অবৈজ্ঞানিক নয়—হাস্যকরও বটে এই তত্ত্ব।

সম্প্রতি বিশেষ করে গত দশকে, পশ্চিম ইয়োরোপ, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায় মনরোগের ব্যাপক দ্রুত বিস্তৃতির উল্লেখ প্রথমেই করেছি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাই সমাজবিদ ও মনরোগবিদরা আজ সামাজিক কারণ অনুসন্ধানে তৎপর। গোঁড়া ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। শিল্পাগ্রসর দেশগুলোতে, বিশেষ করে আমেরিকায় এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি লক্ষ্য করে অদ্ভূত অদ্ভুত তত্ত্বের অবতারণা করছেন এ-দশকের সমাজবিদ্যা ও মনোবিদ্যার পণ্ডিতরা।

বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতি ও উৎপাদন-ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের প্রয়োগকে এঁরা মনরোগের এই ব্যাপক বিস্তৃতির কারণ হিসেবে ধরে নিয়েছেন। দ্রুত পরিবর্তন নতুন পুরনোর দ্বন্দ মানুষকে অস্থির করেছে; নতুন পুরনোর দ্বন্দ্ব নিশ্চয়ই সংঘাত এর সৃষ্টি করে, কিন্তু সংঘাত ঘটলেই নিউরোসিস হবে এমন কোন বিধান নেই। সংঘাত ও দ্বন্দ্ব ছাড়া যে কোনধরণের অগ্রগতি বা বৃদ্ধি অসম্ভব। নতুন পুরনোর সংঘর্ষকে মনরোগের মৌল ও একমাত্র কারণ হিসেবে দাঁড়

করানোর চেষ্টা অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। সমাজ ব্যবস্থা ও উৎপাদন ব্যবস্থায় অতিদ্রুত ও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে সোবিয়েত রাশিয়ায়। সেখানে আমরা জানি মনরোগের বিস্তার ত' ঘটেই নি, বরঞ্চ প্রসার ক্রমসংকুচিত। মনরোগের কারণ নির্ণয়ে মানসিক আঘাত, বা প্রক্ষোভ জনিত আলোড়নকেও অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এ যাবৎ। মানসিক আঘাত-দরুন যে চাঞ্চল্য দেখা যায়, তাকে সব সময়ে মনোবিকারের পর্যায়ে ফেলা যায় না। প্রেমের প্রত্যাখ্যানে, পরমাত্মীয় বিয়োগে, অহেতুক চরিত্রদোষারোপে—মনস্তাপে ভুগবেন সবাই। —জীবনে দুঃখ বিক্ষোভ থাকবেই, অন্যায্য প্রত্যাশা ও তৎজনিত নিরাশা আসবেই। বাঁচতে গেলে, মাঝে মাঝে মর্মন্তুদ বেদনা, গুরুতর আঘাত, উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কার সম্মুখীন হতেই হবে। এরকম অবস্থায় সাময়িক ভাবে মনের শান্তি হারানো—নিউরোসিসের লক্ষণ নয়। ব্যক্তির নার্ভতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও আঘাতের প্রভাবের গুরুত্বের উপর নির্ভর করে—এসব ক্ষেত্রে মনরোগ দেখা দেবে কিনা! মনঃপীড়া হলেই মনরোগ জন্মাবে এ ধারণা ঠিক নয়। মানসিক কারণের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ সামাজিক কারণগুলিকে চোখের আড়ালে নিয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে মানসিক কারণগুলিকে যদি বংশানুক্রমিক বা অপরিবর্তনীয় বলে আখ্যাত করা হয় এবং বাস্তব নিরপেক্ষ বলে ভাবা হয়।

আমেরিকান মনরোগবিদ ফার্স্ট এর মতে—"We would regard neurosis as being the intensive reflection within the sick individual's practice and consciousness of certain highly individualistic, destructive and antisocial qualities engendered by specific aspects of the social system in which he lives ঃ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার শোষণ-ধর্মিতা অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা ও নিরাপত্তার অভাব।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় শোষণ-ধর্মিতা অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা ও নিরাপত্তার অভাব বোধ থেকে নিউরোসিসের জন্ম। আমাদের এই সমাজে শিশুর লালন পালনে অধিকাংশ পিতা মাতাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে থাকেন, শিশুর মনে মাতা পিতার মধ্যেকার মানসিক দ্বন্দ্বের প্রতিফলন ঘটে। (পুরুষ প্রধান সমাজে সত্যিকারের সুস্থ স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক বিরল!) এ ছাড়া খেলা, সিনেমা ও গল্পের ভেতর দিয়ে এই সমাজের নিষ্ঠুরতা, শোষণ, প্রতিযোগিতা, স্বার্থপরতা, এবং সর্বোপরি আজকের দিনে পরমাণবিক ভীতি শিশুর মনে বিকারের সৃষ্টি করবে এই তো স্বাভাবিক। সুতরাং পিতামাতার অস্বাভাবিকতা নয়, সমাজের অস্বাভাবিকতাই নিউরোসিসের কারণ। সমাজের দুর্নীতি মাতাপিতার মধ্য দিয়ে শিশু মনকে সংক্রামিত ও বিকৃত করে এইমাত্র।

শিশু সাধারণতঃ পরিবেশের প্রতিটি উদ্দীপকে সাড়া দেয়। বাড়ীতে হোক বা স্কুলে হোক তাকে যদি নিয়ত পূর্ব উল্লিখিত ধ্বংসাত্মক ও নঞর্থক উদ্দীপনার সম্মুখীন হতে হয়, তার মধ্যে নিউরোসিসের লক্ষণ প্রকাশ পাবে এটাই তো স্বাভাবিক।

ফ্রয়েডপন্থীরা নিউরোসিসের কারণ নির্ণয়ে বয়ঃ সন্ধিকালের যৌন সমস্যার ওপর খুব গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মানুষের যৌনলিপ্সা পুরোপুরি সহজাত প্রবৃত্তি মূলক বা জীবধর্মানুগ—একথা আমরা বিশ্বাস করি না। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় বটে মানুষের এই রিপুটি অত্যন্ত প্রবল এবং একে কেন্দ্র করে যে সব সমস্যার উদ্ভব হয়, সে গুলির সমাধান অত্যন্ত কঠিন। একথা সত্যি, বয়ঃ সন্ধিকালে দেহ মনের কতকগুলি বিশেষ পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং সামান্য অনবধানতা বা অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যও যৌনকেন্দ্রিক মনোবিকারের উদ্ভব হতে পারে। কিন্তু সমাজ ব্যবস্থা যদি শোষণকেন্দ্রিক না হয় ও কিশোর কিশোরীর শিক্ষা ব্যবস্থা যদি উন্নততর হয়, এ সমস্যা নিঃসন্দেহে অনেক সহজ হয়ে আসে। যৌন সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা, কুসংস্কার ও রহস্যময়তা এ সমস্যাকে ঘোরালো করে

তুলেছে। বিশেষ করে ফ্রয়েডীয় যৌনসর্বস্বতত্ত্ব, ইদিপাস ও ইলেকট্রাকমপ্লেসের সরস বর্ণনা সম্বলিত মনস্তত্ত্বের বই, পত্রিকা, ও চলচ্চিত্র অভিভাবকদের মনে যে যৌন বিকারের উন্মেষ ঘটায় তার কিছুটা অন্তত কিশোর মনে সংক্রামিত হয়। যদি সমাজে বা পরিবারে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার স্বীকৃত হয় ও নারীর হীনমন্যতা দূরীভূত হয়, তবে যৌন সমস্যা নিঃসন্দেহে অনেক কম দেখা দেবে। এবং কিশোর কিশোরীদের এই সম্পর্কিত ভুল ভ্রান্তি অনেক কম ঘটবে। আমরা সত্যিকারের স্নেহ প্রেম ও ভালবাসার বিকাশ দেখতে পাব এবং এদের মূলে অবদমিত যৌনাবেগের কল্পনা করে আঁতকে উঠতে হবে না।

বয়ঃসন্ধিকালে, এই সমস্যা সমাকীর্ণ সমাজে, কিশোর কিশোরীরা কোনও সুস্থ, সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের ছবি দেখতে পায় না। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ অতি সীমিত হওয়ায় এবং উদ্দেশ্যমূলক সৃজনধর্মী কর্ম প্রেরণার অভাবে এরা বয়ঃপ্রাপ্তদের নৈরাশ্যবাদ ও সিনিসিজ্‌মের অংশীদার হয়ে ওঠে। পলায়নী মনোভাব থেকে যৌন-লিপ্সা ও আনুসঙ্গিক বিকৃতি বৃদ্ধি পায়। এর ওপর এই বিশেষ সময়ে যে পুষ্টিকর খাদ্য ও পেশী-সঞ্চালনী ব্যায়ামের প্রয়োজন খুব কম ছেলে মেয়েদের মধ্যে সে সুযোগ ঘটে। দৈহিক স্বাস্থ্যহীনতা মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায়। স্কুল কলেজে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ব্যবস্থাও কিশোর মনের বিকৃতির অন্যমত কারণ। মোট কথা, সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যা, নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার অভাব, আত্মকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা, সহযোগিতা-মূলক সমবায় প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা—কিশোরমনে যে প্রভাব বিস্তার করে, ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক সে সম্বন্ধে খুব বেশী উৎসাহী নন। বাস্তব কারণকে এভাবে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা উদ্দেশ্য প্রণোদিতই হোক আর অজ্ঞতা প্রসূতই হোক, রোগ বিজ্ঞানের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

বস্তুবাদী মনরোগবিদ্‌রা কোনো সময়েই মেণ্ডেল-মরগ্যানের বংশানুক্রমিকতা তত্ত্বকে ও মানব মনের অপরিবর্তনীয়তাকে আমল দেননি। মিচুরিনেরতত্ত্ব আজ এদের ধারণাকেই সমৃদ্ধ করেছে। পরিবর্তনশীল জীবন মানবমনে নতুন গুণ ধর্মের উন্মেষ ঘটায় ও বিশেষ অবস্থায় সেই গুণ ধর্ম সন্তান সন্ততিতে বর্তায়। পাভলভ সপ্রমাণ করেছেন—মস্তিষ্ককোশের ও নার্ভ তন্ত্রের জন্মগত বৈশিষ্ট্য বাস্তব জীবনের পরিবেশের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। সামাজিক ধ্যান ধারণা, শিক্ষাদীক্ষা, সমাজে মানুষের বিশেষ অবস্থান কেন্দ্র ও তজ্জনিত সুখ-সুবিধা : এই সমস্তই চরিত্র ও মানসিকতার আসল সংগঠক। জার্মাণ পণ্ডিত Kretschmer-এর প্রভাব পশ্চিমী মনরোগবিদদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। জন্মগত বৈশিষ্ট্যেই মানব চরিত্রের নির্ধারক,—Kretschmer-এর এই সনাতনী মতবাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন পাভলভ। মিচুরিন-পাভলভের বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি পুরনো দিনের আত্মার অবিনশ্বর-তত্ত্বকে ধুলিসাৎ করেছে। সবকিছু পরিবর্তব্য—সময়ে সঠিক ব্যবস্থা অবলম্বন করলে মনোধর্মের পরিবর্তন সম্ভব—এই প্রগতিশীল ধারণা মনরোগ-চিকিৎসকদের মনে নতুন আশা ও উৎসাহের বাণী এনে দিয়েছে। মনরোগের কারণ নিহিত রয়েছে সমাজ-ব্যবস্থার বিচ্যুতি-বৈষম্যের মধ্যে এবং এ রোগের চিকিৎসা বা প্রতিরোধে সামাজিক কারণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ সর্ব প্রধান কর্তব্য বলে মনে করেন পাভলভ অনুগামী চিকিৎসকরা।

> "The pride of the poor is humiliated, talents are not appreciated, modesty is insulted, the sanctity of feelings is ridiculed, honesty is disbelieved and rights are disrespected. ………Physically, poverty means lack of food, unwholesome food, unhealthful housing, shabby clothes and footwear, diseases are neglected to the utmost ; all of which fosters the development of insanity."

যে সব দেশে মনরোগের প্রাদুর্ভাব ক্রম-বর্ধমান, গত শতাব্দীর এক রুশ-চিকিৎসকের এই উক্তি, সে-সব দেশের পক্ষে আজও প্রযোজ্য নয় কি ?

সম্পাদক—**ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়**
ডাঃ জ্যোতির্ময় শর্মা কর্তৃক অভ্যুদয়, ৩০, সূর্য সেন ষ্ট্রীট, কলি-৯ থেকে মুদ্রিত ও ডাঃ সোমনাথ মুখার্জি কর্তৃক
১৩২/১এ, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত।

বাহার ২.১০—২.৬০
জুপিটার ৭.৫০—১১.৫০
জল ৯.৫০—১৩.৫০
কাজল ১২.৯৫
বীণা ৯.৫০
রূমিলা ১২.৯৫
ইজি ২২.৯৫
সেলর ২৫.৯৫

শরতের শোভাযাত্রা... চলুন মেলামেশার মহোৎসবে

এই মহোৎসব আজ শরতের পথে অগ্রসর। সকলের কর্তব্য সপরিবারে যোগদান। তার জন্য এখুনি প্রস্তুত হতে হবে। নতুন বেশে সাজতে হবে। নতুন জুতোয় চলতে হবে। সেরা জুতো পাবেন বাটার দোকানে। শরৎশোভার এখানে বিচিত্র আয়োজন।

মনে রাখবেন, দিন যত বাড়ে, ভিড় তত বাড়ে। সুতরাং আসুন সকালের দিকে। সকালের বাজার —আরামের বাজার।

Bata

সুলেখা

ফাউন্টেনপেন কালি

সর্বোচ্চ বিক্রয়ের গৌরব
অর্জন করেছে

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বে • মাদ্রাজ

KNOW THE LAND OF SOCIALISM

BOOKS FROM U.S.S.R

On U S S R. :

V. Uvachan :	
People of the Soviet North	0·31
A. Denishov, M. Kirichenko :	
Soviet State Law	2·69
Soviet Statistics	1·25
N. Baransky :	
Economic Geography of U.S.S.R.	3·00
G. Metelsky :	
Lithunia, Land of the Nieman	2·50
L. Sheinin :	
Diary of a Criminologist	0·62
P. Alampiev :	
Where Economic inequality is no more	2·00
M. Deineko :	
The Land of Soviet— the Country and the People	1·25
Forty Years of the Public Education in USSR	0·31
P. Luknitsky :	
Soviet Tadjikistan	2·12
V. Vitkovich :	
A Tour of Soviet Uzbekistan	2·06

Medical Scienec & Psychology

F. Asratyan :	
I. Pavlov—Life & works	0·75
A. Ivanov Smolensky :	
Essays and the Pathophysiology of the Higher Nervous Activity	2·87
V. Zelenin :	
Strengthen Your Heart	1·87
K. Bykov :	
The Cerebral Cortex and the Internal Organs	9·87
I. Velvovsky & others :	
Painless Childbirth through Psychoprophylaxis	6·25
K. Figarnov :	
Painless Childbirth	0·12
K. Platonov :	
The Word as a Physiological and Therapeutic Factor	9·37

NATIONAL BOOK AGENCY PRIVATE LTD.
12 Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12
Branches : 172 Dharamtala Street, Calcutta-13
Nachan Road, Benachity, Durgapur-4

V/O "MEZHDUNROADNAYA KNIGA"
MOSCOW, 200, USSR